সুরের পরশ

দেবাচার্য

সোল ডিস্ট্রিবিউটার্স

রিডার্স এসোসিয়েট

হেড অফিস : ৪বি, রাজা কালীকৃষ্ণ লেন

ব্রাঞ্চ : ৯৩, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৫

প্রথম প্রকাশ :
অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯
প্রকাশক :
শ্রীঅজিতমোহন মিত্র
"বুক সাপ্লায়াস"
৯, কালী মিত্তির লেন,
কলিকাতা।
প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা :
শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রাকর :
শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
৭২।১, কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২
মূল্য—দুই টাকা

ভূমিকা

বন্ধুবর দেবাচার্যের নিজের লেখা ইংরাজি কাহিনীর স্বকৃত বাংলা অনুবাদ প'ড়ে তাঁর সঙ্গে ব্যবসায়গত পরিচয় আত্মীয়তায় পরিণত হয়েছিল, আমি তাঁর মধ্যে অকস্মাৎ নিজেদের গোষ্ঠীর একজনকে আবিষ্কার ক'রে খুশি হয়েছিলাম এবং 'বিমুগ্ধ পৃথিবী'র পরিচয়-প্রসঙ্গে সে খুশি ব্যক্ত করতে দ্বিধা করি নি। আমার মনে আশা ছিল, বাংলা ভাষার মৌলিক কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে একদিন না একদিন তাঁর সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠতর পরিচয় ঘটবে, কারণ সাহিত্যিক হিসাবে এ বিশ্বাস আমার বরাবরই আছে যে বিধাতা যাঁকে অলৌকিক এই আনন্দের ভার দেন তাঁর বক্ষের অপার বেদনা, তাঁর নিত্য জাগরণ একদিন না একদিন প্রকাশ ও সার্থক হবেই। কিন্তু আমার আশা ও বিশ্বাস যে এত শীঘ্র পূর্ণ হবে সত্যিই আমি তা ভাবতে পারি নি। 'সুরের পরশ' প'ড়ে আমি শুধু আনন্দিতই হই নি, বিস্মিতও হয়েছি। এ ভূমিকা তারই প্রকাশ।

দেবাচার্য অতি সামান্য আয়োজনে আমাকে রসনা-তৃপ্তিকর ভোজের আনন্দ দিয়েছেন। তাঁর শিল্পবুদ্ধি সদাজাগ্রত, তাঁর ভাষা স্বচ্ছ ও সুন্দর এবং মানবমনের গহনলোকে তাঁর স্বচ্ছন্দ গতি। বইখানি আমার মত বাংলা দেশের সাধারণ পাঠককে তৃপ্তি দেবে এই ভরসাতেই এর সঙ্গে তাঁদের পরিচয় সাধনের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করেছি। দেবাচার্যের অভিজ্ঞতা অনেক অথচ জীবন-দর্শন জটিল নয়, তাই আশা করছি শুধু-সুরের পরশ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হবেন না, তাঁর সুর উত্তরোত্তর আরো [illegible] হয়ে আমাদের শ্রবণ-পথে অন্তরে প্রবেশ করবে।

১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯ } শ্রীসজনীকান্ত দাস

"সায়ান্স অব পামিস্ট্রি" রচয়িতা আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন পণ্ডিত দেবাচার্য সামুদ্রিক জ্যোতিষী হিসাবে লোক-সমাজে পরিচিত। কিন্তু তিনি যে শক্তিশালী গল্প-লেখক, ঔপন্যাসিক ও কবি সেই পরিচয় অনেকেই জানেন না। সাহিত্যিক জগতে নবাগত হলেও তাঁর রচিত ছোট গল্প "দেবাচারিয়া ও তরুণী" (গল্প-ভারতী) ও "মহাপাপ" (শারদীয়া উষা); "বিমুগ্ধা পৃথিবী" (উপন্যাস—সুমিত্রা প্রকাশক) ও "সীমা" (বৌদ্ধযুগের কাহিনী) শ্রেষ্ঠ সমালোচকদের কাছ থেকে উচ্চ প্রশংসা পেয়েছে। আমরা আশা করি, দেবাচার্যের [illegible] উপন্যাস "সুরের পরশ" পা[illegible]কের মনোহরণ করবে।

এই বইটির

"সুরের পরশ" নামকরণের জন্য

বন্ধুবর সাহিত্যিক বিমল দত্তের

নিকট আমি ঋণী

লেখক—

ক্ষুধার্ত বৎসর শেষ নিঃশ্বাস টানে। রাস্তার ধূলোর মধ্যে মায়ের রক্তে সিক্ত সদ্যোজাত উলঙ্গ [illegible] কেঁদে ওঠে ওঙা, ওঙা। দুর্বল, শীর্ণ শিশু সহজেই নির্জীব [illegible] কালবৈশাখীর ঝড়ো হাওয়ায় মিলিয়ে যায় ক্ষীণ কণ্ঠের আওয়াজ।

মুষলধারে বৃষ্টি সুরু হয়।

ময়লা, ছেঁড়া শার্ট গায়ে লোকটা এই দিকেই আসছে। এক গাল দাড়ি, আলোছায়ায় চোখ দুটো জলজ্বল করে। একে বৃষ্টি, তারপর ব্ল্যাক-আউটের রাত্রি, ভাল করে নজরে আসে না কিছুই।

হঠাৎ যেন চমক ভাঙ্গে লোকটির। দশহাত দূরে বড় বাড়ীটার লোহার ফটকের কাছে এগিয়ে যায়, চেন ধরে ঝন্ ঝন্ শব্দ করে, ধাক্কা দেয়।

বাড়ীর দরোয়ান তখনো জেগে, তুলসীদাসের রামায়ণ সুর করে পড়ছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাঁক দিয়ে বলে :

"কৌন হ্যায় ?"

"দরোয়ানজী! শীগ্‌গির দরজাটা খোল। একটা ভিখিরিণীর ফুটপাথের উপর ছেলে হয়েছে। মা-টা বেঁচে নেই, ছেলেটা এখনও মরে নি।"

হিন্দুস্থানী দরোয়ান গণপতি ছাতা খুলে খড়ম পায়ে এগিয়ে আসে। ভিখিরিণীর পাশে দাঁড়িয়ে মৃতদেহের দিকে টর্চ্ ফেলে দেখে। কয়েকমুহূর্তের জন্য বিহ্বলভাবে তাকিয়ে থাকে গণপতি। হিন্দী ভাষায় পরমাত্মাকে উদ্দেশ করে অভিযোগ

জানায়। ভাববার আর সময় নেই, শিশুটি নতুন আবেগে কেঁদে ওঠে—ওঙ্গা ওঙ্গা।

ধূলো ও রক্তমাখা শীর্ণ শিশুটিকে পরম স্নেহে তুলে নেয় গণপতি নিজের বুকের মধ্যে। পথচারীও তাকে অনুসরণ করে নিঃশব্দে। প্রাসাদোপম অট্টালিকার গাড়ীবারান্দা অতিক্রম করে এগিয়ে যায় দুজন।

পথচারীর পক্ষে সৌভাগ্য বলতে হবে। একটি হতভাগিনীর নবজাত শিশুকে উপলক্ষ্য করে তার পরিচয় হয়ে যায় প্রাসাদের অধিস্বামী ডাঃ নির্মল রায়ের সঙ্গে। শত চেষ্টা করেও তারা বাঁচাতে পারে নি শিশুকে। কিন্তু একঘণ্টার উপর যমের সঙ্গে টানাটানি যুদ্ধে ধনঞ্জয় নির্মল রায়ের সহকারীরূপে যে পরিশ্রম করেছিল তা অভিজ্ঞ ডাক্তারের চোখ এড়িয়ে যায় নি।

একমাস পর একটা বিজ্ঞাপন দেখে ধনঞ্জয় ডাঃ নির্মল রায়ের সঙ্গে দেখা করে। নির্মল ডাক্তার বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীছাত্র, এম, এস, সি ; এম, বি ; এম, আর, সি, পি ইত্যাদি বহু ডিগ্রীর অধিকারী। ডাক্তারি তার পেশা হলেও, লেবরেটারীর কাজের দিকে ঝোঁক বেশী। বাড়ীর মধ্যেই ছোট খাট লেবরেটারী সাজিয়ে কয়েক বৎসর ধরে নানা দেশী গাছ গাছড়া থেকে ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে সে কয়েকটি অভিনব ও সর্বসাধারণের পক্ষে সুলভ ওষুধ বের করবার সুদুষ্কর সাধনায় ব্যস্ত। বয়স বত্রিশ তেত্রিশ হবে। দীর্ঘাকৃতি, গৌরবর্ণ, সুদর্শন। অবিবাহিত। চোখে পুরু লেনসের চশমা। কপালে প্রতিভার ছাপ সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

একে একে অনেক কয়জন কেমিষ্ট্রি গ্র্যাজুয়েট ইণ্টারভিউ সেরে যায় ; অবশেষে ধনঞ্জয় প্রবেশ করে। নির্মল ডাক্তারের গায়ে ছিল সিল্কের গাউন, হাতে পাইপ, ড্রয়িং-রুমের কার্পেটের উপর কি যেন

চিন্তা করতে করতে পায়চারী করছে আর মাঝে মাঝে পাইপ টানছে।

"আরে তুমি! এস এস। কি নাম যেন তোমার? আমি কিন্তু একদম ভুলে গেছি।"

"ধনঞ্জয় বোস।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ঠিক, এইবার মনে পড়েছে! তারপর কি মনে করে?"

"বিজ্ঞাপন দেখে এসেছি। সার আমি একজন—মানে—"

"থাক, থাক, তোমাকে আর সার সার করতে হবে না। আমার নাম নির্মল ডাক্তার। তুমি কি বি, এস, সি?"

"আজ্ঞে? আমি—"

"কেমিষ্ট্রিতে অনার্স ছিল কি?"

"আজ্ঞে আমি বি, এস, সি কোর্স শেষ করেছিলাম, কিন্তু—"

"কিন্তু ফেল করেছ, এই না?"

"না সার, পরীক্ষে দেওয়া আর হয়ে ওঠে নি।"

"আবার সার!"

ধনঞ্জয় অপ্রতিভভাবে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। নির্মল ডাক্তার ঘরের মধ্যে আর এক চক্র ঘুরে এসে কর্কশ কণ্ঠে জিগ্যেস করে, "কেন পরীক্ষে দাও নি?"

ধনঞ্জয় প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে এক নজর চোখ বুলিয়ে বলে, "একটা চাকরী পেয়ে গেলাম, পয়সার টানাটানি, পরীক্ষে আর দেওয়া হয়ে ওঠে নি।"

"তোমার বাপ মা আছেন?"

"না, তাঁরা অনেকদিন আগেই মারা গিয়েছেন রেঙ্গুণে।"

"রেঙ্গুণে!"

"হ্যাঁ, রেঙ্গুণে বাবা কাজ করতেন। আমি বার্মার মানুষ, এই এক বছর হল বাংলা দেশে এসেছি।"

"তোমার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কলকাতায় আর কেউ নেই ?"

"কেউ নেই, আমিই আমার অভিভাবক।"

ধনঞ্জয় কথা বলতে বলতে থেমে যায়। নির্মল ডাক্তারের কানে যেন আর কোন কথাই যাচ্ছে না। হঠাৎ অন্যমনস্ক ভাবে স্থানত্যাগ করে উঠে যায় সিঁড়ির দিকে। বারান্দার কোণ দিয়ে মার্বল পাথরের সিঁড়ির ধাপগুলি উঠে গিয়েছে এঁকে বেঁকে। সিঁড়ির মাঝখানটায় ল্যাণ্ডিংএর উপর দেওয়ালে আটকানো একটি অয়েল পেণ্টিং। ছবিটা মনোযোগ দিয়ে দেখে নির্মল ডাক্তার। ধনঞ্জয় ডাক্তারের অদ্ভুত ব্যবহারে বিস্মিত হয়।

হঠাৎ কেন অসম্ভব গম্ভীর হয়ে গেলেন ভদ্রলোক? সে কি কোন অন্যায় কথা বলেছে ? কৈ কিছুইতো বলে নি, তবে ? ধনঞ্জয় ভেবেই পায় না কি কারণে ডাক্তারের এই ভাবান্তর হোল। অনেকখানি আশা জেগেছিল মনে, ধনী গৃহস্বামীর স্নেহের সুরে যেন আশ্বাসও ছিল খানিকটা। কিন্তু আর বোধ হয় কোন আশা নেই!...

নির্মল ডাক্তার ফিরে আসে ড্রয়িংরুমে, ঘন ঘন পাইপ টানতে থাকে, আর ভ্রূ কুঁচ্‌কিয়ে ধনঞ্জয়ের মুখের দিকে তাকায়। বলে, "তোমাকে চাকরীতে বহাল করলাম।

কিন্তু কাল দশটা বাজ্‌তে না বাজতেই লেবরেটারীতে হাজির হবে। লেট লতিফদের উপর আমার কোন আস্থা নেই। আর একটা কথা—

দাঁড়ি গোঁফ কামিয়ে আসবে। এমন সুন্দর চেহারা তোমার, অমন ভূতের মতন দাঁড়ি-গোফ রেখেছ কেন! পোষাক আশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়, বুঝলে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

নির্মল ডাক্তার আর কোন কথাই বলে না। ধনঞ্জয় নমস্কার করে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। যাক, বাঁচা গেল, একটা চাকরীতো মিলল এতদিন পর। কিন্তু কি অদ্ভুত ব্যবহার! মরুকগে, লোকের

ব্যবহারের কথা ভেবে আমার কিছুই লাভ হবে না। হন্ হন্ করে চলতে থাকে ধনঞ্জয়। গলির পর গলি পেরিয়ে আরও সরু গলির মধ্যে প্রবেশ করে সে। তার ছেঁড়া জুতোটার পেরেকটা উঠে এসেছে খানিকটা, পায়ের পাতায় যন্ত্রণা অনুভব করলেও আনন্দে ভুলে যায় সব বেদনা। এতদিন পর চাকরী মিলেছে তার। মেসের ম্যানেজারের বাক্যবাণে আর জর্জরিত হতে হবে না, বিড়ি টেনে টেনে মুখটা যেন পুড়ে গিয়েছে, সিগারেট খাওয়াও চলতে পারে এবার।

মেসের সিঁড়ি পার হয়ে দোতালায় উঠতে গিয়েই ধাক্কা খায় উড়ে চাকরটার সঙ্গে। হাতে চায়ের কাপ দুটো ভর্তি চা নিয়ে নেমে আসছিল ম্যানেজারের ঘরে মাগুনী। মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, "কেমনো লোকো আপুনি ? দেখিতে পাইছেন না ?"

ধনঞ্জয় একবার অপ্রতিভভাবে চাকরটার দিকে তাকায়, তারপর পকেট হাতড়ে একটা আটআনি বের করে বকশিষ ছুড়ে দেয়—"যা যা বেটা যা, একটা ভাল সিগারেট—ক্যাপষ্টান, সিজার যা পাস বুঝলি। আজকে বেহালা বাজিয়ে শোনাব, আসিস ঘরে।"

বেহালার নাম শুনে মাগুনী একগাল হেসে দাঁত বের করে বলে—"হেঃ হেঃ, আপুনি ঘরো মধ্যে যাই বিশ্রামো করি লেন, আমো ম্যানেজার বাবুরে চা দেই তুরন্ত আপনারো সিগারেট আনি দিবে।"

—দুই—

জাপানীরা যেদিন বোমা ফেলে, হেড কোয়ার্টাস থেকে হুকুম পেয়ে গোরা সৈন্য পশ্চাদপসরণ করতে সুরু করে তার আগেকার রাত্রির ঘটনা।

রাত্রি অন্ধকার। বর্ষামুখর। অলোক রায় অর্থাৎ স্টেশনের সর্বকনিষ্ঠ সহকারী স্টেশন মাষ্টার ভিন্ন সবাই পালিয়েছে শেষ ট্রেনে। স্টেশন প্ল্যাটফরম সম্পূর্ণ জনমানবহীন। বাঙ্গালী ও ভারতীয় পাড়াটা স্টেশন ঘেঁষেই গড়ে উঠেছিল গত পঞ্চাশ বছরে। বেশ সমৃদ্ধিশালীই ছিল ভারতীয়েরা এ অঞ্চলে। অনেকের পূর্বপুরুষ এসেছিল বার্মাশেল কোম্পানীর চাকরী নিয়ে অথবা ডাকবিভাগের কাজে। কেউ বা এসেছিল চালকল অথবা করাতকলের হিসাব-রক্ষক হয়ে। এদের পুত্র পৌত্রাদি বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন মিলেই গড়ে উঠেছিল পাড়াটা, জমেও উঠেছিল বেশ। ভারতীয়দের মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল বাঙ্গালী অথবা মাদ্রাজী—ব্যাঙ্কের কেরাণী, ডাক্তার, ওষুধ ব্যবসায়ী, অথবা দোকানদার। —ডাল চাল নুন, অথবা লুঙ্গীর ব্যবসা করত—তারা সবাই প্রাণভয়ে পালিয়েছে। জিনিষপত্র ও সমস্ত সম্পত্তির মায়া ত্যাগ করেই পালিয়েছে তারা। মাদ্রাজী গার্ড পিণ্টোর সঙ্গে অলোক রায়ের বহুদিনের পরিচয়। ইংরেজীতে বারবার অনুরোধ জানায় গার্ড, “রায়! পাগলামী কোরো না, আমার কথা শোন। এস আমাদের সঙ্গে। এখানে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়।”

অলোক সিগারেটের ছাই ফেলে। মুখে মৃদু হাসি। হাত নেড়ে বিদায় অভিনন্দন জানায়। কোথায় যাবে সে? বর্মায় যখন এতদিন কেটে গেল, এখানে যদি মৃত্যু আসে আসুক। জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে—সবই

বিধিলিপি। আর পথেই যে কোন বিপদ ঘটবে না তারি বা কি নিশ্চয়তা ?

এখানকার কাছাকাছি গ্রামের বর্মীদের সঙ্গে তার পরিচয় অনেক দিনের। তাকে খুন করবেই বা কেন ? কি বা আছে তার—সম্পত্তির মধ্যে তো একটা বহু পুরানো পৈত্রিক বেহালা ! বর্মীদের মধ্যে বেহালা-বাদক ও সুদক্ষ অভিনেতা হিসেবে তার খ্যাতিও কম নয়। স্থানীয় লোকের মধ্যে কেউই তার অঙ্গস্পর্শ করবে না এ বিষয়ে অলোকের দৃঢ় ধারণা। আর যদি জাপানী বোমায় তার মৃত্যু লেখা থাকে, তাহলেও বিশেষ উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই। বাপ, মা, বোন, ভাই কোন আত্মীয়স্বজনের বালাই নেই তার। দুফোঁটা চোখের জল ফেলবার যদি কেউ থাকত তাহলে হয়তো বা—দূর ছাই অত চিন্তায় কাজ নেই।

টিম্ টিম্ করে কেরোসিনের আলোটা জ্বলছে—চেয়ারে গা এলিয়ে অলোক রায় পা নাচায় আর সিগারেটের পর সিগারেট ফুঁকে যায়।

তার মনে আত্মপ্রসাদের তৃপ্তি। কাপুরুষ সে নয়। অসংলগ্নভাবে চিন্তা করে। মরে যদি আজ রাত্রে, আমেরিকায় যেন জন্মায় সে পরজন্মে। ব্যাটারা কি আরামেই থাকে, একেবারে কুবেরের রাজ্য—ফেঁদে ফেলবে একটা মস্ত বড় ব্যবসা। এরোপ্লেন তৈরী করবে হাজারে হাজারে, আর উড়ে বেড়াবে আজকে এদেশ, কালকে ওদেশ। থাক, দরকার নেই অত টাকায়—সে এবার জন্মাতে চায় এস্কিমোদের দেশে। শীল মাছ খেয়ে বেঁচে থাকবে—শ্বেতভল্লুক অথবা সিন্ধুঘোটকের সঙ্গে লড়াই করতে হবে হয়ত—বরফের পর বরফ—শুধু শাদা।...

জীবন সম্বন্ধে অদ্ভুত বৈরাগ্য পেয়ে বসেছে তাকে। ভবিষ্যতের জন্য বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠাও নেই, উৎসাহও নেই। টেবিলের উপর সেফটি রেজর, ওটা দিয়ে মাথা মুড়িয়ে সাধু সেজে বসলে কি হয় ? বর্মীরা সাধু সন্ন্যেসীকে মানে, দুই একটা সংস্কৃত অং বং আউড়ে দিলেই হোল, ব্যাটারা ভয় পেয়ে যাবে নিশ্চয়, অঙ্গস্পর্শও করবে না।

কৈ কোন লুটেরা তো এখনো এদিকে এল না? আশ্চর্য !...

ব্রেক কষার শব্দ কানে আসে।

তাইতো, ওপারে পিচের রাস্তার পর হেডলাইটের আলো! মোটর থেকে লাফিয়ে নামছে দুটো মূর্তি। এইবার প্ল্যাটফরমের দিকে এগিয়ে আসছে। কাঁটা তারের জন্য ঘুরে আসতে হয় খানিকটা, ওভারব্রিজ ছাড়া প্ল্যাটফরম প্রবেশ অসম্ভব।

...লাফিয়ে, ঝাঁপিয়ে, সিঁড়ি টপ্‌কে রুদ্ধশ্বাসে কারা দুজন এগিয়ে আসছে? বর্ষাতিতে সারা অঙ্গ ঢাকা, মাথায় টুপি, স্ত্রী পুরুষ, গন্ধর্ব কিন্নর, কিছুই বুঝবার উপায় নেই।

একটি মূর্তি চীৎকার করে বলে, "একি ব্যাপার মাষ্টার? তোমাকে না আমি বলে পাঠালুম? ট্রেনটাকে দু মিনিট লেট করালে না কেন? কি ক্ষতি হোত? এখন আমাদের উপায়?"

প্রশ্নকর্তার স্বরে বিরক্তি, ভয় ও উদ্বেগের সংমিশ্রণ।

অদ্ভুত অভিযোগে অলোক রায় সোজা হয়ে বসে চেয়ারে। বিদ্রূপ মিশ্রিত বিনয়ের সুরে জিগ্যেস করে, "আজ্ঞে, কিছু যদি না মনে করেন, তাহলে আপনার নামটা জানতে পারি কি? কে আপনি?"

ওয়াটার-প্রুফে সর্বাঙ্গ ঢাকা সামনের মূর্তিটি ভিজে টুপি মাথা থেকে খুলতে খুলতে এগিয়ে আসে আলোর দিকে। কোন উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই অলোক বলে চলে—"একি ব্যাপার!

এ যে দেখছি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, স্বয়ং গুপ্তসাহেব! বিশেষ দুঃখিত, মিঃ গুপ্ত! তাইতো, ট্রেনটা ছেড়ে গেল! তা আপনি ভুল করলেন কেন?"

"ভুল! কি ভুল?"—মিঃ গুপ্ত অসহিষ্ণুভাবে ঘাড় ঝাঁকান।

"এই বলছিলাম কি, আপনার একটা সেকসন উল্লেখ করে দেওয়া উচিত ছিল, নয় কি? অনায়াসে ড্রাইভার ও গার্ডকে ডেকে বলতাম, ট্রেন ছেড়েছো কি, আর রক্ষে নেই। টু ইয়ার্স রিগারাস ইমপ্রিজনমেণ্ট। এই আর কি।"

অলোক আপন রসিকতায় হো হো করে হেসে ওঠে।

অদৃষ্টের পরিহাস একেই বলে! বর্মার প্রখ্যাতনামা জবরদস্ত সিভিলিয়ান শিরোমণি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট উপাধিওয়ালা মেম্বর, যাকে বলে এম, বি, ই, আইন-ভঙ্গকারীর সাক্ষাৎ কৃতান্ত স্বরূপ মিঃ গুপ্ত কিনা—?

অলোকের মনে পড়ে একবার সে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কুঠিতে দেখা করতে গিয়েছিল। দুঘণ্টা অতীত হবার পর বেয়ারাকে অনেক খোসামোদ করে জানতে পারে সাহেব তখনও ভীষণ কাজে ব্যস্ত, যার তার সঙ্গে দেখা করবার প্রচুর সময় তার নেই।

আজ সেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব স্বয়ং তারি দরজায় এসে উপস্থিত!

ক্রুদ্ধ গুপ্তসাহেব জীবনে বোধ হয় সর্বপ্রথম নিজেকে সংযত করেন। দূর থেকে বোমার গর্জন কানে আসে। রাইফেলের আওয়াজও শোনা যায়। বর্মী জয়ঢাকের শব্দও ভেসে আসে বাতাসে। জাপানী সৈন্যেরা এগিয়ে আসছে। চারিদিকে ঘোর অরাজকতা। প্রকাশ্য দিনের আলোয় বর্মীরা লুট করে ফিরছে। যেখানে যা পাওয়া যায় তো নিচ্ছেই, তাছাড়া অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করছে যাকে পাচ্ছে সামে—তাকেই। ইংরেজ ও ইংরেজ সেরেস্তার কর্মচারী ভারতীয়দের উপর তাদের আক্রোশ সবচেয়ে বেশী।

আকাশের বুকে মেঘ ডাকতে থাকে। প্রচণ্ড শব্দে নিকটে কোথাও বজ্রপাত হয়। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে অলোক দেখতে পায় একটি সুন্দর মুখ—ভীতা, চকিতা, বিবশা কিশোরীর।

আশ্চর্য! এতক্ষণ টেরও পায় নি সে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের উপর যত রাগই থাকুক তার, মেয়েটির জন্য আশঙ্কা জাগে মনে। পুনরায় দূর পাল্লায় বোমার আওয়াজ আসে। বৃষ্টি এবার মুষলধারে পড়তে থাকে।

—তিন—

গাঢ় অন্ধকার রাত্রি, চার হাত দূরের জিনিষ দেখা যায় না। ব্যাঙ্ ডাকে, ঝিঁঝিঁ পোকার বিলাপ শোনা যায়। অসংখ্য কীটপতঙ্গ সেই শব্দের সঙ্গে সুর মিলায়। স্টেশন ঘরের আনাচে কানাচে লক্ষ লক্ষ অশরীরী আত্মার আর্তনাদ। যেন গুমরে গুমরে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় দরজা জানালা সব ঝন্ ঝন্ করে ওঠে। টেলিগ্রাফের পোস্টগুলো ঘিরে বিরামহীন শোঁ শোঁ শব্দ—অনির্দিষ্ট ভয়াল ভবিষ্যতের হাতছানি।

মিঃ গুপ্ত উদ্বিগ্নভাবে বলেন, "মোটরটায় মালপত্র সবই পড়ে রইল। সবই লোপাট হয়ে যাবে দেখছি।"

অলোক অসহিষ্ণুভাবে ঘাড় নাড়ায়।

"জাহান্নমে যাক মালপত্র—শীগগির আসুন আমার সঙ্গে—এক মুহূর্তও আর দেরী নয়।"

"জীবনে যা কিছু সঞ্চয় সব যাবে।" মিঃ গুপ্ত পুনরায় ইতস্ততঃ করেন ও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন।

"এখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবার সময় নয়, মশাই, বেঁচে থাকলে ঢের রোজগার করতে পারবেন।"

"পরের স্টেশন পর্যন্ত মোটর চালিয়ে যাওয়া যায় না? সেখানে গেলে কোন সাহায্য মিলতেও পারে।"

"রাস্তা নেই। হয় গাছে ধাক্কা খেয়ে, না হয় খানাখন্দে পড়ে প্রাণটা যাবে। তাছাড়া এই অন্ধকার রাত্রে কিছু দেখাও যাবে না।"

"তা হলে এখানেই মরতে হবে আমাদের! ওরা একবার টের পেলে আর রক্ষে থাকবে না। পুড়িয়ে মারবে—আমাকে—ওদের—ওদের—"

প্রৌঢ় গুপ্তের চোখে মুখে বিভীষিকার ছবি ফুটে ওঠে। তিনি কথা আর শেষ করতে পারেন না। স্নায়ু শিথিল হতে শিথিলতর হয়ে আসে। দামী জিনিষপত্রের মায়া কি সহজে ছাড়া যায়? সব গোছগাছ করে নিয়ে আসতে শেষ ট্রেনটা গেল ছেড়ে। কেনই বা জিনিষপত্রের মায়া করতে গেলেন? অশোকা তো বার বার নিষেধ করেছিল। 'বাবা, চল, চল, দেরী করো না।' এখন ধনও গেল, প্রাণও যেতে বসেছে এবং তার সঙ্গে—মিঃ গুপ্তের বুকটা কাঁপতে থাকে—মেয়েটির ভাগ্যে কি ঘটবে কে জানে?

একমাত্র মেয়ে—বড় আদরের অশোকা।

মানসিক উত্তেজনায় মিঃ গুপ্ত হঠাৎ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তাঁর সংজ্ঞাহীন দেহ ভিজে মেজের উপর লুটিয়ে পড়ে। ক্ষিপ্রগতিতে অলোক ধরে ফেলেছিল, না হলে মাথায় লাগত খুব।

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটে।

মেয়েটি এরূপ অবস্থার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। আশঙ্কায় তার মুখ আরও ফ্যাকাশে হয়ে যায়, চোখ দিয়ে দুফোঁটা জল ঝরে পড়ে।

"ওকি খুকী, তুমি কাঁদছ? এখন কি কান্নার সময়? আমি ভাবলাম বুঝি খুব সাহসী মেয়ে।"

মেয়েটি কোন উত্তর দেয় না, রুমাল দিয়ে চোখ ঢাকে।

"এখনও কাঁদছ? তাহলে কাঁদো! আমি চল্লাম।" অলোক রাগের ভান করে এবং স্থান-ত্যাগ করার ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ায়।

মেয়েটি এইবার বলে ভাঙ্গা গলায়—"কি করতে হবে বলুন?"

গলার স্বর উত্তেজনায় বিকৃত কিন্তু অলোকের কাছে মনে হয় ভারি মিষ্টি। একেবারে ছেলেমানুষের গলা।

"তোমার বাবা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু আর এক মুহূর্তও দেরী করা চলে না। এখান থেকে এখুনি সরে পড়া দরকার।"

ক্ষণেকের জন্য থামে, পুনরায় বলে চলে, “এখন বাঁচবার একমাত্র উপায় স্টেশনে আগুন লাগিয়ে পাম্পিংরুমে লুকিয়ে থাকা।

রাত্রিবেলায় এই বৃষ্টির মধ্যে পালাবার কোন উপায়ই আমি দেখতে পাচ্ছি না। সকাল হলে একটা কিছু উপায় বের করা যাবে হয়তো।

শীগ্‌গির তুমি একটা কাজ কর—”

কথা শেষ না করেই অলোক এক লাফে ল্যাম্পরুমের দিকে এগিয়ে যায়। একটা টিন থেকে তেল বের করে। টেবিলের ও র‍্যাকের উপর হিসেবের যে সব খাতাপত্র ছিল তাতে কেরোসিন ঢালে। পকেট থেকে দেশলাই বের করে আগুন ধরায়। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে।

মিঃ গুপ্তের অচৈতন্য দেহ কাঁধে তুলে নিয়ে এগিয়ে যায় অলোক অন্ধকার ও বৃষ্টির মধ্যে। মেয়েটি নিঃশব্দে অনুসরণ করে।

—চার—

হালকা লোহার সিঁড়ি বেয়ে তারা নেমে আসে।

"তোমার নাম কি খুকী ?"

প্রায়ান্ধকারে মেয়েটি অলোকের দিকে ফিরে তাকায়, দাঁতে দাঁত চেপে বলে, "অশোকা।"।

"ঠিক আছে। শোক করো না, ভয় করো না। আমার নাম অলোক, মানে কোন লোকেরই আমি ধার ধারি না, বুঝলে ?"

অলোক পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে, একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে সুরু করে। কিছুক্ষণ চুপচাপ। অশোকার বয়েস ষোল পেরিয়ে সতেরয় পড়েছে, তাকে কিনা লোকটা খুকী বলে সম্বোধন করছে। বিপদের মধ্যেও কৌতুক অনুভব করে অশোকা।

থাক, চোখ না থাকাই ভাল, ভালয়, ভালয় রাত্রিটা কাটলে হয়।...

জল আর ময়লা—চারিদিকে ডিজেলের গন্ধ—ইঞ্জিনটার আশেপাশে গ্রীজ ছড়িয়ে আছে। মাত্র কয়েকদিন আগে পাম্পটা বদলান হয়েছে, নতুন নিকেলের প্লেটটা অন্ধকারে চকচক করে।

অচৈতন্য পিতার মাথাটি কোলে নিয়ে অশোকা বসে এক কোণে। তার মনে সহস্র চিন্তার ভিড়।

কৈ বাবার তো এখনো জ্ঞান ফিরল না ?

তবে কি ?...

প্রাণপণ চেষ্টায় প্রবল কান্নার বেগ দমন করে অশোকা।

চোখ মুছে অন্ধকারের মধ্যে নিজের চারিপাশটা আর একবার দেখে নেবার চেষ্টা করে। উপরে টিনের ছাউনির নীচে একটা ছিদ্রপথ দিয়ে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলকানির আলো প্রবেশ করে।

মাষ্টার বসে আছে পাম্পটার উপর পা ঝুলিয়ে—রাত্রির অন্ধকারে মুখের চেহারাটা ভাল করে নজরে আসে না।

দুর্যোগরাত্রির সাথী—অজানা, অচেনা যুবক মাষ্টার। বর্মার রেলওয়ে কর্মচারী মাত্রেই মাতাল, লম্পট চরিত্রের এমন কথা অশোকা শুনে এসেছে নানা জায়গায়।

লোকটা কি ওর দিকে চেয়ে আছে ?

মনে কোন কুঅভিসন্ধি নেই ত ?

এই অন্ধকার ঘরের মধ্যে—বাবা অচৈতন্য—যদি অভদ্রতা প্রকাশ করে তাহলে সে কি করতে পারে ? বিশালাকৃতি যুবক আর সে সবে কৈশোর পার হয়ে যৌবনে পা দিয়েছে, তার সর্ব দেহে ও মনে লজ্জা, ভীতি ও আশঙ্কার দুরু দুরু।...

লোকটা কি উঠে দাঁড়াল ?

ঠিকই তো, এগিয়ে আসছে !

আশেপাশে হাত বাড়িয়ে অশোকা দেখে নেয় যদি কোন ধারালো লোহার জিনিষ পাওয়া যায়, ভারী রেঞ্চ টেঞ্চ কিছু। এক ঘা বসিয়ে দেবে লোকটার মাথায়।

থর থর করে কাঁপতে থাকে অশোকা !...

একি ! লোকটা তো এখনও তাকে স্পর্শ করে না ! স্পর্শ করবার চেষ্টা না করে দেশলাই জ্বালায়। তার দৃষ্টি অশোকার দিকে নয়—মিঃ গুপ্তের মুখের 'পর। মেজের উপর উবু হয়ে গম্ভীর ভাবে নাড়ী পরীক্ষা করে।

অশোকার হঠাৎ মনে হয় মাষ্টারের বয়েস বেশী নয়। কত আর হবে—বড় জোর পঁচিশ। মুখখানা বেশ সুন্দর দেখতে কিন্তু !...

আঙুলে আঙুলে স্পর্শ লাগে দৈবাৎ; কিন্তু লোকটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না ঘটনাটিকে। অশোকার নবোদ্ভিন্ন যৌবনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেই যেন বলে—"ভয় নেই খুকী ! তোমার বাবার নাড়ী

এখন অনেকটা ভাল। অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঐ শোন নাক ডাকছেন। ভয় নেই। কিছু খেয়ে টেয়ে এসেছিলে তো ?"

অশোকার গলা থেকে কোন স্বর বের হয় না।

"দেরী করে তো ট্রেনটা ফেল করলে, তা অন্ততঃ খাওয়া দাওয়াটা যদি সেরে আসতে তাও একটা কাজ হোত !"

এবারেও অশোকা কোন উত্তর দেয় না। কিই বা বলবে সে ?

"স্টেশনবাড়ীটা পুড়ে শেষ হয়ে এল বুঝি। বিস্কুটের টিনগুলো ফেলে রেখে এসেছি বাসায়। সর্বনাশ করেছে, বেহালাটাতো ফেলে এসেছি !"

অলোক আর দাঁড়ায় না। এক লাফে সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে তরতর উঠে যায়। শেষ ধাপে উঠে মুখ ফিরিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলে, "ভয় নেই, এখুনি ফিরে আসব, তুমি এইখানে—উপরে উঠো না কিন্তু।" অলোককে আর দেখা যায় না।

অশোকা অবাক হয়ে বসে থাকে।

—পাঁচ—

এক ঘণ্টার উপর সময় পার হয়ে যায়, তবুও অলোকের দেখা নেই। গুপ্ত সাহেবের চৈতন্য ফিরে আসে। পুনরায় ঘুমিয়ে পড়েন। অশোকা তাঁর চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দেয়। এখন তাঁর নাক ডাকছে।

মেজেতে রেণকোট দিয়ে বালিশ বানিয়ে অশোকা নিদ্রিত পিতার মাথা নামিয়ে রাখে কোল থেকে। উঠে দাঁড়িয়ে খোলা চুল ঝুঁটি বেঁধে নেয়। একবার, দুবার, তিনবার এগিয়ে যায়। প্রতিবারেই ফিরে আসে। বাইরের দিকে তাকায়, পরক্ষণেই পিতার দিকে ফিরে চায়।

চোর, ডাকাত, বদলোক হয়তো লুকিয়ে আছে আশেপাশে। একবার তাদের হাতে পড়লে কি হবে? ভয়ে শিউরে ওঠে অশোকা। বাইরে যাবার সাহস হয় না আর।

একমাত্র ভরসার স্থল এখন স্টেশনমাষ্টার। ভাল হোক, মন্দ হোক, বাঙ্গালী। লোকটার সাহস ও বল দুইই আছে। অনেক ফন্দি ফিকির জানে, পথঘাটও তার চেনা। একটা কিনারা হলেও হতে পারে।

অশোকা উদ্বিগ্ন হয়। বাস্তবিক লোকটার কি হোল? ফিরছে না কেন? সেই কখন বেরিয়েছে! একটা সামান্য বেহালা আর কয়েক টিন বিস্কুটের জন্য কি শেষকালে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা গেল লোকটা?

বুকের ভিতরটা আশঙ্কায় কাঁপতে থাকে।

আর ইতস্ততঃ করে না সে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসে উপরে। ভিজে মাটির স্পর্শে তার শরীরে নতুন চেতনা জাগে, ক্ষণেকের জন্য ঠাণ্ডা বাতাস প্রাণভরে টেনে নেয় ফুসফুসের মধ্যে, তারপর সন্তর্পণে এগিয়ে যায় স্টেশন স্টাফের কোয়ার্টার লক্ষ্য করে।

স্টেশন বাড়ীটাকে ঘিরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে—আশে-পাশের গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের ছায়ায় ছমছমে ভাব। বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। পথ পিছল, সাবধানে না চললে পড়ে গিয়ে আঘাত পাবার আশঙ্কা খুব। অশোকা ভয়ে ভয়ে মাঝে মাঝে চারিদিকে চেয়ে দেখে নেয় কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা।

স্টাফ কোয়ার্টারের দিকে আগুন যায় নি। স্টেশন মাস্টার, এসিস্ট্যাণ্ট স্টেশন মাস্টার—সবাইএর বাসার দরজা খোলা। কাছাকাছি আসতে না আসতেই বিদ্যুৎগতিতে একটি ছায়ামূর্তি ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসে।

ঝপাং করে শব্দ হয়।

আর একটু হলেই অশোকা সভয়ে চীৎকার করে উঠত। বৃষ্টির জল জমেছিল একটা প্রকাণ্ড গর্তে, তার মধ্যে লাফিয়ে পড়েছে একটি জানোয়ার। পলাতক মুদী রমেশ আচার্যির পালিত ষাঁড়—যাকে বাজারের দোকানদাররা পর্যন্ত ধর্মের ষাড় বলেই রেহাই দিত— ভয় পেয়ে লাফ দিয়েছে পাঁকের মধ্যে।

তবু যা হক একটা প্রাণী—ভূত বা ডাকাত নয়। ষাঁড়ের ডাক শুনে অশোকার দুঃখের মধ্যেও হাসি আসে। সাহস ফিরে পায়।

ফিরে যায় স্টেশনের দিকে, আগুনের তাপ এড়িয়ে পাশ কাটিয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। তাই তো, দুরে ওভারব্রিজের উপর ওরা কারা ?

বেহালা-কাঁধে একজনের ছায়ামূর্তি—কতকগুলি লোকও দেখা যাচ্ছে—হ্যাঁ, বর্মী বলেই তো মনে হয়। ঘিরে আছে লোকগুলো, ছায়ামূর্তি বেহালার উপর ছড় টেনে চলেছে, আর এরা ঘুরে ফিরে নেচে চলেছে। অস্পষ্ট বেহালার সুর ভেসে আসে কানে।

কি যেন অদ্ভুতসুরে বর্মীরা মাঝে মাঝে তাল ঠুকে ছড়া কাটছে। বোধ হয় কোন লোকনৃত্য ও সঙ্গীত, চাপা গলায় গাইছে সবাই। গানের কলি দুই একটা এইবার পরিষ্কার শোনা যায়।

অন্ধকারের সাহায্যে আরও নিকটে এসে দাঁড়ায় অশোকা।

কি সর্বনাশ! মাস্টারটা বদ্ধ পাগল—না হলে ঐ সব খুনে লোকদের সঙ্গে তাল রেখে বেহালা বাজায়! কি বিশ্বাস ওদের? যদি এখুনি রামদা নিয়ে দেয় এক কোপ! কি দরকার ছিল? বেহালার খোঁজে না বের হলে তো আর এই ফ্যাসাদ হোত না।

কি আশ্চর্য! লোকগুলো যে চলে যাচ্ছে উল্টো দিক লক্ষ্য করে। মাস্টার কি যাদু জানে? তাইতো, মাস্টার বেহালা কাঁধে নেমে আসছে এদিকে। একলাই! সঙ্গে কেউ এল না! তবে কি? অশোকার কাছে সমস্তই রহস্যময় মনে হয়, সে নিঃশব্দে অপেক্ষা করে।

"অলোকবাবু!"

"কে? কে?"

"আমি।"

অলোক অশোকার নিকটে এসে মুখটা পরীক্ষা করে দেখে নেয়, সন্দেহ দূর হতেই ধমকের সুরে বলে ঃ

"অশোকা! তুমি কি করতে বাইরে এসেছ? তোমাকে না আমি বল্লাম অপেক্ষা করতে?"

"অপেক্ষা করেই তো ছিলাম; কিন্তু আর কতক্ষণ অপেক্ষা করব, বলুন? সেই যে গেলেন আর আপনার দেখা নেই।"

"দেখা নেই তো কি হয়েছে! তুমি বাইরে এসে আমার কি উপকার করলে? একেবারেই বোকা মেয়ে দেখছি, যাও শিগ্‌গির ফিরে যাও নিজের জায়গায়।"

অশোকা স্থানুর ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে, স্থানত্যাগ করবার কোন লক্ষণই দেখা যায় না।

"এখনো দাঁড়িয়ে রইলে যে? না, একটা বিপদ না ঘটিয়ে ছাড়বে না দেখছি।"

"আপনিও তো দাঁড়িয়ে আছেন"—অশোকা মৃদুকণ্ঠে উত্তর দেয়, "বিপদ তো আপনারো হতে প্যারে।"

"আমার কিছু হবে না—ওরা, দেখলে, সব চলে গেল, আমাকে যে ওরা চেনে। আমার বাজনা শুনতে ওরা পাগল। আশেপাশের গ্রামের চাষী ওরা, ওদের সঙ্গে আমার বহুদিনের আলাপ। ভাল কথা, তোমাদের মালপত্র লুট করে নিয়েছে ওরা, কিন্তু মোটরটা আমাকে বকশিষ দিয়ে গিয়েছে—ওদের মনোমত অনেকগুলো গৎ বাজিয়ে শুনিয়েছি—তাইতো এত দেরী হোল—ঐ দেখ, তোমার সঙ্গে বকে চলেছি। পালাও, পালাও, শিগ্‌গির ফিরে যাও।"

পুনরায় দূর পাল্লার বন্দুকের আওয়াজ শোনা যায়। অনেকগুলো লোকের সমবেত কণ্ঠধ্বনি দূর হতে পুনরায় ভেসে আসে। অন্য আর একদল বুঝি আসছে এবার!

অশোকা তবুও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অলোক অধীরভাবে বলে, "কৈ, যাচ্ছ না যে?"

"আপনি না গেলে আমিও যাব না।"

"কি বল্লে! আমি না গেলে তুমি যাবে না! কি আশ্চর্য! ভয়ঙ্কর বেয়াড়া মেয়ে দেখছি তুমি। আমি মরি বাঁচি তাতে তোমার কি?"

অশোকা ঈষৎ হেসে উত্তর দেয়, "আপনার বেঁচে থাকায় আমাদের স্বার্থ আছে বৈ কি।"

মুখে ঈষৎ হাসির আভাস। পূর্বের আশঙ্কা ও আড়ষ্টভাব কেটে গিয়েছে কোন ঐন্দ্রজালিকের প্রভাবে।

অলোক বিস্মিতভাবে অশোকার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। এরকমভাবে কি কোন কিশোরী বালিকা কথা বলতে পারে?

"এখন আপনিই আমাদের একমাত্র ভরসা।"

কি বলছে মেয়েটি!

এরকম মিষ্টি কথাতো আর কেউ শোনায় নি। অন্ধকার রাত্রে মেয়েটির বয়েস আন্দাজ করা কঠিন ; শুধু দুটি ভীরু চোখের চাহনিতে জ্বলছে জোনাকীর আলো—অলোক অনুভব করে।

পিছল পথ বেয়ে পাশাপাশি এগিয়ে চলে দুজন। ধুক্ ধুক্ ধুক্—বুকের স্পন্দনের সঙ্গে মিশে যায় আশেপাশের জঙ্গলের অস্ফুট, অর্দ্ধ-গুঞ্জরিত ও দুর্বোধ্য আওয়াজ। মশা কাঁদে, ব্যাঙ্ ডাকে, দূর থেকে নদীর জলকল্লোল ভেসে আসে কানে।

—ছয়—

পরদিন সকালে মেয়েকে নিয়ে মোটরে উঠতে উঠতে মিঃ গুপ্ত পুনরায় আক্ষেপ করেন—"যা কিছু দামী জিনিস সব ব্যাটারা লুট ক'রে নিয়েছে। ট্রেনটা যদি"—বলতে বলতে থেমে যান।

তখনো সূর্য ওঠে নি। অলোক ড্রাইভারের সীটে বসে। মাইল খানেক দূরে ফেরী ঘাট। কাঁচা রাস্তা দিয়ে লাফাতে লাফাতে মোটর-কার এগিয়ে চলে। অলোক একটা সিগারেট বের করে বাঁ হাত দিয়ে। ডান হাতে শুধু ষ্টিয়ারিং ঠিক রাখা কঠিন; যা এবড়ো-খেবড়ো পথ। এখুনি ধাক্কা খেতো একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে! অশোকা ভয়ে চোখ বোজে। লোকটার কোন আক্কেল নেই। এই বিপদের মধ্যে পালিয়ে যাওয়াই প্রধান কাজ। আর রাস্তা যা খারাপ।. এক হাতে কি—?

হঠাৎ অলোক মোটর থামিয়ে দেয় সশব্দে। আবার কি হ'লো? কি নেশা! পকেট হাতড়ে দেশলাই খুঁজছে বোধ হয়? কোথায় পাবে দেশলাই? ফেলে এসেছে নিশ্চয়। মিঃ গুপ্ত পুনরায় আক্ষেপ সুরু করেন।

অলোক বিরক্ত ভাবে মোটরে স্টার্ট দেয় পুনরায়; বিরক্তিতে তার ভ্রূকুঞ্চিত হয় বারবার।

যত ঝামেলা! কি দরকার ছিল এদের এভাবে বিপদে পড়বার?... জাহান্নমে যাক বুড়োটা, চুলোয় যাক তার দামী জিনিস পত্র! অষ্ট প্রহর হা-হুতাশ আর ঘ্যানঘ্যানানি শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছে অলোকের। পিছনে না ফিরে সামনের দিকে তাকিয়ে নীচু গলায় বলে,—"ভগবানের বিশেষ দয়া, এখনো প্রাণে বেঁচে আছেন।"—

কথা অসমাপ্তই থেকে যায়; আরেকটা কি যেন বলতে গিয়েও থেমে যায় সে।

মিঃ গুপ্ত নিজের চিন্তায় বিভোর, তাছাড়া কানেও খুব ভালো শোনেন না। অলোকের কথা শুনতে পাননি; পুনরায় বিড়বিড় করেন আর অভিযোগ জানান, "যদি ট্রেনটা—আর কয়েক মিনিট—কয়েক মিনিট লেট করানো কি যেত না?...গেল, সবি গেল!......"

কপালের ওপর দিয়ে ঘনঘন হাত চালান, আর মনে মনে অলোকের ওপর চটতে থাকেন! যত নষ্টের মূল হ'লো এই ছোকরা মাস্টারটা। নিশ্চয়ই খবর পেয়েও কিছু বলেনি। গার্ড, ড্রাইভার—আশি একশ টাকার মাইনের চাকর—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যখন নিজের হাতে লিখে স্লিপ দিয়ে পাঠিয়েছেন—দু'চার মিনিট খুব লেট করত যদি মাস্টারটা না......।

পুনরায় বিড়বিড় সুরু করেন। অশোকা অলোকের কথাগুলি কিছু কিছু শুনতে পেয়েছিল। শঙ্কিত হ'য়ে ওঠে, কি জানি এই ব্যাপার নিয়ে বাবার সঙ্গে মাস্টারের আবার ঝগড়া না বাধে! বাবারও যেমন মেজাজ, আর মাস্টারটাও কেমন যেন কাটাকাটা কথা বলতে ভালবাসে। লোকটাকে চটানো ঠিক হবে না। বাবাকে সান্ত্বনা দেয় অশোকা: "কেন বাবা মিছিমিছি দুঃখু করছ? যা গেছে তা গেছে; বাংলা দেশটাতো এখনো আছে! সেখানে তোমার জমিদারীর যা আয় তাতে তোমার অর্থকষ্টের তো কোন ভয় নেই। এখন কি ক'রে দেশে ফিরে যাওয়া যায় তাই ভাবা উচিত নয় কি? এখনও পথ সবটাই বাকি।"

গলা আরো নীচু ক'রে অলোকের দিকে চেয়ে ইঙ্গিত করে অশোকা—"ওকে চটানো ঠিক হবে না এ অবস্থায়।"

......অলোক মনে মনে ভাবে—কি আপদ! কোন সমস্যাই ছিল না তার জীবনে। যেহেতু জীবন ও মৃত্যু—দুটোর ওপরই তার

সমান ঔদাসীন্য। সবার ছেড়ে যাওয়া স্টেশনের একচ্ছত্র অধিপতি হ'য়ে থাকার কি মজা!...আই অ্যাম দি মনার্ক অব অল আই সারভে। সেলকার্কের মতনই বলা চলতো। এতক্ষণে সোফাটার উপর শুয়ে শুয়ে সিগারেট ফুঁকে যেত দশ বারটা। চা ক'রে খেত। যত দোকানদার সবাই জিনিসপত্র ফেলে দৌড় মেরেছে। খাবারের অভাব কি? পাশের হোটেলওয়ালা বিজয় বাড়ুজ্জের ভাঁড়ারের চাবিই তো তার কাছে রেখে গিয়েছে। বেচারা! কি ভীতু! অতবড় পালোয়ান চেহারা, একটা বাচ্চা বউএর যা সাহস তাও নেই। কেবল কাঁদে আর বলে, অলোকবাবু, কি হবে আমাদের? কোথায় যাব? কি করবো? আরে ম'লো, কোথায় যাবে, যাও, চুলোয় যাও, জাহান্নমে যাও, আমি কি জানি! যতসব ভেড়া, বিয়ে করলেই বোধ হয় পুরুষগুলোর মনের সাহস কমে যায়। ভাগ্যিস বিয়ে করি নি। দূর ছাই, বিয়ে করবো কাকে? বাজে, বাজে চিন্তা। বিয়ে করা মানে বিশেষরূপে বহন করা। একপাল ছেলে মেয়ে নিয়ে বড় মাস্টার যদুবাবু যা নাজেহাল! রাম বল, থুক্!

...এলোমেলো চিন্তার ভিড়।...

সামনে ইরাবতীর নদীর পাড় দেখা যায়। ফেরী ঘাটে কোথাও কেউ নেই। সাম্পানের কোন কিছু চিহ্নও দেখা যায় না। যতদূর নজর যায় শুধু জল আর জল। আর দুই পাড়ে বনের বিস্তার।

অলোকের দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে মিঃ গুপ্ত হতাশার সুরে বলেন,—"এখন কি উপায়? চাপরাশীটাকে তোমার কাছে পাঠালুম, ট্রেনটা যদি আর কয়েক মিনিট আটকে রাখতে তুমি, তাহলে আজ এই বিপদে পড়তে হ'তো না।"

অশোকা বাবাকে বাধা দেবার আগেই অলোক ক্রুদ্ধস্বরে উত্তর দেয় —"থামুন, আপনার ঐ এককথা শুনতে শুনতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে দেখছি।"...

কি ভেবে যেন নিজেকে সংযত করে। কৈফিয়তের ভঙ্গীতে বলে, "আপনি জানেন না যে আপনার চাপরাশী আমাকে কোনো খবরই দেয় নি। সে নিজেই দেরী ক'রে এসেছিল, হয়তো জানালা দিয়ে কামরায় ঢুকতে হ'য়েছে তাকে। খবর দিলেই বা আমি কি করতাম? যা অরাজক অবস্থা! কে আমার কথা শুনবে?"...

মিঃ গুপ্ত চোখ পাকিয়ে শোনেন। অশোকাও অলোকের বিরক্ত ও অভিমানাহত মুখের দিকে তাকায়।

অলোক চুপ ক'রে থেকে আবার বলে—"আমাদের পক্ষে এখন স্টেশনে ফিরে যাওয়াই উচিত। স্টেশন ইন্‌স্পেক্টরের ট্রলিটার খোঁজ করা দরকার। গুদাম ঘরের আশেপাশে সেটাকে যেন সকালে আসবার সময় দেখলাম মনে হ'লো; ট্রলিটার সন্ধান পেলে আমরা মিকিন পর্য্যন্ত যেতে পারবো। তারপর সেখান থেকে বেসিন পর্য্যন্ত পৌঁছে গেলে আর কোনো ভাবনা নেই। জাহাজে করেই ফিরে যেতে পারবেন।"

আবার মোটর ফিরে চলে স্টেশনের দিকে। বিশ্বস্ত বন্ধুর মতন ট্রলিটা দাঁড়িয়ে আছে ঠিক জায়গায়।

অশোকা ট্রলিটার দিকে তাকিয়ে ভরসা পায় না।

"বেতের চেয়ারে বসলে আমার মাথা ঘুরবে।"

"তাহলে নীচেই বসো তুমি। গুপ্তসাহেব তাড়াতাড়ি উঠুন; ওইদিক দিয়ে কারা যেন আসছে।"

কথা শেষ হতে না হতে রাস্তার বাঁকে একদল বর্মী ডাকাত দেখা দেয়। পরণে রঙীন লুঙ্গি, হাতে রাম দা—সূর্যের আলোকে ঝলমল করছে। বিকট উল্লাসধ্বনি শোনা যায়।...

মুহূর্তের জন্য অলোক দাঁড়িয়ে থাকে, অপেক্ষা করে, কি যেন ভাবে। তারপর রেললাইনের ওপর উবু হ'য়ে খোয়া কুড়ুতে থাকে।

অশোকার দিকে ফেলে দেয় ঝপ্‌ঝপ্‌। "খোয়াগুলো আঁচলে নাও, ট্রলি ঠেললে পড়ে যেতে পারে।"

...ট্রলি চলতে থাকে, থেমে থেমে, হাঁফিয়ে যায় অলোক, ডাকাতরা ক্রমশঃ আরো নিকটে এগিয়ে আসে। একটা ছোরা সাঁ ক'রে অলোকের কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়, আর একটা ছোরাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে ট্রলির গায়ে লেগে ঝন্‌ঝন্‌ করে ওঠে। বৃদ্ধ হতাশায় ভেঙ্গে পড়েন।

"অশোকা, খোয়াগুলো আমার হাতে যোগান দাও"—অলোকের দৃঢ় কণ্ঠস্বরে অশোকা সম্বিৎ ফিরে পায়।

"এক, দুই, তিন!" শান্তভাবে কথাগুলো উচ্চারণ করছে যেন সে। খোয়াগুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। বুকফাটা চীৎকার শোনা যায়। মাথা ফেটেছে কারুর, অথবা বুকে ভীষণ আঘাত পেয়েছে নিশ্চয়। ডাকাত দলের লোকেরা থমকে দাঁড়ায়।...

ট্রলি চলতে থাকে, দূরে, বহুদূরে, পিছনের কোন শব্দই আর শোনা যাচ্ছে না।

—সাত—

বোমার আঘাতে ব্রিজ ধ্বংস হ'য়ে গিয়েছে, ট্রলির সাহায্যে আর পথ এগুনো সম্ভব নয়।

নদীর পাড় ধরে হাঁটতে সুরু করে তারা। পথঘাট অলোকের কিছু কিছু জানা থাকলেও মাঝে মাঝে দিক ভুল হ'য়ে যায়, পুনরায় পিছিয়ে এসে অন্যপথ ধরে হাঁটতে হয়।

মাইলের পর মাইল জলাভূমি। মাঝে মাঝে উঁচু উঁচু ঢিবি। কোথাও বা ছোট ছোট ঝোপজঙ্গল। দৈত্যের মতন বিরাট বিরাট শালগাছগুলো সীমাহীন অরণ্যের বিস্তারে মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে মেঘের সঙ্গে জড়াজড়ি ক'রে।

অরণ্য পার হ'য়ে আবার জলাভূমি। জলাভূমি পার হলে আবার অরণ্য। পাহাড়পথের দুপাশ দিয়ে ক্রমশঃ উপরে উঠে গেছে।

ঐ পাহাড়টা পার হলেই বা কি? আবার আর একটা পাহাড় দেখা যাবে।

অশোকার মনে হয় কোনো ঐন্দ্রজালিকের মায়ায় আটকা পড়েছে তারা। আর তাদের কোনোদিনই মুক্তি নেই। বিরাট প্রকৃতির এই দুর্ভেদ্য আবেষ্টনের মধ্যেই যে তাদের সবাইকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে না তাই বা কে জানে?

দিনে কেবল পথ চলা, আর রাত্রে প্রতি মুহূর্তে একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় আড়ষ্ট অবস্থায় বসে থাকা। ঘুমুবে কি ক'রে? সাপ, বাঘ, মশা। আগুন নিভে গেলেই জীবন সংশয়। এ অবস্থায় কি কেউ ঘুমুতে পারে? বাবা আর অলোকবাবু অবশ্য তাকে অভয় দিয়েছেন, বলেছেন, "তুমি ঘুমোও, আমরা জেগে আছি।"

কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না।...ভাবতে ভাবতে ভোর হ'য়ে আসে।

শাড়ীটা ছিঁড়ে গিয়েছে নানা জায়গায়। মিঃ গুপ্তের খাকী হাফপ্যাণ্ট মজবুত খুব। এখনও অক্ষতই আছে, তবে হাফশার্টটা ময়লা হ'য়ে গিয়েছে। দু'এক জায়গায় ছিঁড়েও গিয়েছে কাঁটার খোঁচায়।

অলোক বাবুর গায়ের কোটটা আরও মজবুত। ট্রাউজারটাও শক্ত বলে ছেঁড়ে নি। তা ছাড়া পথ হাঁটার অভ্যেস ছিল বোধহয়। তাই জঙ্গলের খোঁচা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলবার কৌশল তার জানা আছে আগে থেকেই।

অশোকার মনে হয় পায়ের তলায় ঘা হ'য়ে গেছে যেন। ক্ষুৎ-পিপাসায় অসাড় মনে হচ্ছে দেহটাকে। ক্লান্তি...অপরিসীম ক্লান্তি। বিরামহীন ব্যর্থ নিরুদ্দেশ যাত্রা।

ঐ একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে না? এতদিন পর! পাহাড়ের চূড়ায় ওটা কী? সোনালী রঙের প্যাগোডা হবে নিশ্চয়।

মনে আশা জাগে।

বিপজ্জনক জলাভূমির মধ্যে তারা দাঁড়িয়ে আছে তখনো। বারবার সাপের হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে এসেছে। আলের গর্তের ভেতর থেকে জিব বের করে আছে সাপ। প্রত্যেক ঢিবির মধ্যে বিষাক্ত সাপের আড্ডা। তাছাড়া পিঁপড়ের কামড়, মশা ও নাম না জানা অসংখ্য কীটপতঙ্গের অত্যাচারও কম নয়। ম্যালিগ-ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ার আশঙ্কাও ষোল আনা।

...অশোকার পক্ষে এ এক ভয়ঙ্কর পরীক্ষা। জীবনে হাঁটার অভ্যাস তার মোটেই ছিল না কোন দিন, তার উপর এই পাঁকে আর জলে হাঁটা। শক্তি ও সহ্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে অশোকা। টলতে টলতে ধানক্ষেতের আলের উপর শুয়ে পড়ে সে।

"আমি আর পাচ্ছি না। আপনারা এগিয়ে যান। আমাকে মরতে দিন এখানে।"

ভিজে আলের উপর শুয়ে পড়ায় তার শাড়ীটায় জলকাদা লেগে যায় আরও, খোঁপাটায় ভিজে মাটির ছোঁয়াচ লাগে। কিন্তু কি করবে সে? জ্বরে সর্বশরীর কাঁপছে, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা অথবা বসবারও শক্তি নেই।

যতটা আশঙ্কা করা গিয়েছিল ততটা পরিশ্রান্ত হন নি কিন্তু মিঃ গুপ্ত। বুড়ো হলেও তাঁর শক্ত হাড়। তাছাড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এখনো অটুট আছে বন্দরের দিকটায়, যতই এগিয়ে চলেছেন, ততই মনে জোর বাড়ে তাঁর। একটা সম্পূর্ণ জেলার হর্তা কর্তা ছিলেন, যেসিনে পৌঁছুতে পারলে আর কোন অসুবিধে হবে না সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত। কিন্তু একি বিপদ! অশোকা তো আর এক পাও হাঁটতে পারছে না, তারপর জ্বরে...নিশ্চয় ম্যালেরিয়া—নিউমোনিয়াও হতে পারে, যা বৃষ্টি গিয়েছে মাথার উপর দিয়ে।...

এতক্ষণ অলোক আগে আগে পথ দেখিয়ে চলছিল। পথ ধান ক্ষেতের মধ্য দিয়ে। জল মেপে মেপে চলতে হয়, থামতে হয় বার বার, এদিকে সাবধান—গর্ত আছে; ডানদিকে চেপে আসুন, এইবার আলে উঠুন—সাপ, সাপ সাবধান!

এই রকম ভাবে সমানে সকাল বিকেল কেটে গিয়েছে দিনের পর দিন। আর খানিকটা যেতে পারলেই ভাঙ্গা জমি পাওয়া যাবে কিন্তু অশোকা ভেঙ্গে পড়ল—এখন উপায়?

আশ্চর্য! এর আগেই কেন ভেঙ্গে পড়ে নি মেয়েটি? লোহার মতন শরীর অলোকের, তবুও মাঝে মাঝে মনে হয়েছে আর পারি না, এইবার বসে পড়ি, বিশ্রাম নি; কিন্তু মেয়েটি কি ক'রে এতদিন সমান তালে এগিয়ে এল?

মাঝে মাঝে অশোকার ক্লান্ত মুখ ও শরীরের দিকে তাকিয়ে মনে

হয়েছে হাত বাড়িয়ে সাহায্য করে। প্রথম রাত্রিতে মেয়েটিকে যুবতী মনে হয় নি। পরদিন সকালের আলোয় বুঝতে পারে তার ভুল। একটু লজ্জিতও হয় মনে মনে। কোন কথাই বলেনি, বলবার অবসর পায় নি। মিঃ গুপ্ত হয়ত বা কি ভাববেন চিন্তা করে সে অশোকাকে স্পর্শ করতে সাহসী হয় নি।

কিন্তু অবস্থা এখন যা দাঁড়িয়েছে !

জলা পার হবার আগেই যদি সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে তা হলেই মৃত্যু। আকাশে মেঘ জমেছে—ভীষণ বৃষ্টি নামতে পারে। সেই সঙ্গে ঝড়েরও আশঙ্কা। জ্বরে বেঁহুস হয়ে পড়েছে মেয়েটি, তার পর যদি বৃষ্টি ও ঝড়ের কবলে পড়তে হয় তাহলে আর কোন ক্রমেই রক্ষা করা চলবে না।

"সৌমেনবাবু, আপনি আমার বেহালাটা ধরুন। অশোকাকে কাঁধে তুলে নি। শীগ্‌গির করুন—ঝড়বৃষ্টি আসবার আগেই আমাদের গ্রামে পৌঁছানো দরকার !"

প্রৌঢ় সৌমেন গুপ্ত অলোকের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। ছয় ফুট লম্বা, গৌরবর্ণ মূর্তিটি ক্ষণেকের জন্য সৌমেনবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নিঃশব্দে তিনি বেহালাটি হাত বাড়িয়ে নেন।

অদ্ভুতভাবে মেয়েটি জড়িয়ে যাচ্ছে জীবনের সঙ্গে। অলোক চিন্তা করে কি ভাবে অশোকাকে বয়ে নেবে সামনের পথটা। নরম মাটিতে পা বসে যেতে পারে বার বার, তারপর দুটো হাত থাকবে আটকা। টাল সামলাতে না পেরে যদি—? দুজনেই ভিজে একশা হয়ে যাবে, ফল হবে অশোকার পক্ষে মারাত্মক।

জ্বরের উত্তাপ নরম শরীরের স্পর্শ ভেদ করে অলোককে স্পন্দিত করে অকস্মাৎ। বিদ্যুৎ খেলে যায় শরীরের প্রতি রোমকূপে। শিরায় শিরায় রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে।...

সামনে খুঁড়িয়ে চলেছে ক্লান্ত অবসন্ন প্রৌঢ়। পিছনে অনুসরণ করে যৌবন-মাধুর্য-দৃপ্ত প্রাণ।

বিফল চেষ্টা! দুর্বার অজানিত-পূর্ব শক্তির তরঙ্গের কাছে ভেসে যেতে চায় সকল বন্ধন—একি উম্মাদ প্রাণশক্তি লুকিয়ে ছিল ক্লান্ত দেহের শিরা প্রশিরায়? কোন বাধাই আর বাধা নয়; কোন ভারই আর ভার মনে হয় না অলোকের কাছে।

কি করে পালকের চেয়েও হালকা হ'য়ে গেল মেয়েটি?

আট

ক্রমে মেঘ কেটে আসে। বাতাস উড়ে যায় ফালিফালি হ'য়ে। শুধু গর্জন, বর্ষণ হয় না! সৌভাগ্যই বলতে হবে। অলোক মনে মনে ধন্যবাদ জানায় ভগবানকে।

দীর্ঘ সতেরো দিন একরকম অনাহারেই কেটেছে। এমন পথ দিয়ে এসেছে তারা যেখানে শুধু জঙ্গল আর জল। আজকে সকালেই যা ধানক্ষেতের চিহ্ন দেখা গেল!

বুনো ফল আর শেকড় খেয়ে একরকম দিন কাটাতে হয়েছে। দৈবাৎ একদিন একটা বুনো খরগোশ ধরা পড়েছিল। জানোয়ারটি ভয় পেয়ে লাফ মেরেছিলো ঝোপ থেকে! আটকে গিয়েছিল অশোকার ছেঁড়া শাড়ীর আঁচলে। পিছনেই ছিল অলোক, বিদ্যুৎগতিতে ধরে ফেলেছিল।

খরগোশটি ঝুলিয়ে ধরে হেসে বলেছিল, "ভয় নেই, লাফারু। মানে বুনো খরগোশ। এটাকে পুড়িয়ে খাওয়া যাবে।"

অশোকা কিন্তু এই প্রস্তাবে রাজী হয় নি সহজে। তার মতে জ্যান্ত নিরীহ জীবকে মেরে পুড়িয়ে খাওয়াটা একেবারেই সভ্য জগতের মানুষের ধর্মবিরোধী। মিঃ গুপ্ত অর্থাৎ সৌমেনবাবু অবশ্য মেয়েকে সমর্থন করেন না। এক আছাড়ে খরগোশটাকে পঞ্চত্বে প্রেরণ ক'রে অম্লান বদনে আগুনের সেঁকা মাংসের টুকরোগুলো খেয়ে ফেলেন। রাত্রিতে নাসিকাগর্জনও শোনা যায় তাঁর।

গুহার মুখে আগুন জ্বেলে মুখোমুখি বসে থাকে অলোক আর অশোকা। কাছেই একটা ঝরণা। পাথরে পাথরে সুরের তরঙ্গ তুলে জল নেমে আসছে! আগুনের লাল আলো ঝলমল ক'রছে।

অলোক বেহালাটা বের ক'রে ছড় টানে দু' একবার, তারপর খাপের মধ্যে বন্ধ ক'রে উঠে দাঁড়ায়।

"ওকি, বন্ধ করলেন কেন? বেশতো বাজাচ্ছিলেন। অনেকদিন ভেবেছি আপনার বাজনা শুনবো ; কিন্তু যা অবস্থা।"

প্রথমরাত্রির উন্মাদনায় যা সম্ভব হ'য়েছিলো এখন তা সম্ভব ছিল না। অলোকের ব্যবহারে যেন জড়তা এসে গিয়েছে। সে ভাল করে অশোকার মুখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকতে পারে না। 'তুমি, বা 'আপনি' কোনটা বলেই সম্বোধন করে না। নিতান্ত প্রয়োজনে বলে, ওটা ক'রলেই হতো, এটা না করাই উচিত।

অশোকার কথার জবাবে অলোক চোখ নীচু ক'রে বলে—"থাক ! খালি পেটে বাজনা শুনতে কি কারুর ভালো লাগে?" অশোকা অলোকের বিব্রত ভাব লক্ষ্য করেছে ক'দিন ধরে, সে কৌতুক অনুভব করে, বলে—"কেউ আর আমি একবস্তু নয়। আপনি যদি বাজাতে প্যরেন তাহলে শুনতেও আমার ভাল লাগবে। নিতান্ত খুশী মনেই যে শুনবো সে বিষয়ে আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি।"

কিন্তু বেহালা বাজানো বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে না। হঠাৎ ঝড় ওঠে, বৃষ্টি পড়ে মুষল ধারে। গৎটি অর্দ্ধ সমাপ্ত থেকে যায়। পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় সারা রাত। মিঃ গুপ্তও নিদ্রা-ত্যাগ ক'রতে বাধ্য হন। বৃষ্টির জলে সব ভিজে একাকার।

পরদিন পাথর ছুঁড়ে একটা সজারু শিকার করেন মিঃ গুপ্ত। দাড়ি কামানো হয় নি কয়েকদিন। একগাল খোচা খোচা দাড়ি মুখে যখন তাঁকে পোড়া মাংস খেতে দেখা যায় তখন কে বলবে মাত্র কয়েকদিন আগে তিনি একজন আলোকপ্রাপ্ত সিভিলিয়ন ছিলেন! অলোকও নির্বিকার চিত্তে পোড়া মাংসের স্বাদ গ্রহণ করে আর অশোকাকে অংশ গ্রহণ করবার নিমন্ত্রণ জানায়; অশোকা হাতজোড় করে প্রত্যাখ্যান করে।

নদীতে স্নান ক'রতে গিয়ে কয়েকটা কাঁকড়া আর চিংড়ি মাছ ধরে ফেলে অলোক অভ্যস্ত কৌশলে। মাছ সেদ্ধ খেতে অশোকার আপত্তি নেই। বাড়ীতে কাঁকড়া আর চিংড়ি মাছের চল ছিল তাই রক্ষে

কোন দিন হয়তো অরণ্যের পথে আম গাছের সন্ধান পাওয়া যায়। ছোট্ট মেয়ের মত উচ্ছল খুশীতে হাততালি দিয়ে ওঠে অশোকা। অলোকের মোহ জাগে। বহু কষ্টে, বুকের ছাল উঠিয়ে পিঁপড়ের কামড় সহ্য ক'রে পাকা আম পেড়ে আনে অলোক।

কলমকাটা ছুরি দিয়ে একটা বড়ো পাকা আম কেটে অশোকার হাতে তুলে ধরতে গিয়ে দেখে অশোকা মিটিমিটি হাসছে। মিঃ গুপ্ত সাজারু শিকারে বেরিয়েছিলেন। শুধু দু'জন।

"হাসি কেন ?"

"হাসব না ? আপনার খাওয়ানোর সাধনা দেখে হাসছি। আদিম যুগে কি পুরুষরাই খাওয়াত নারীকে ?"

অলোকের চোখ মুখ লাল হ'য়ে ওঠে। কোন জবাব দেবার আগেই মিঃ গুপ্তের শিকারী মূর্তি দেখা যায়। শূন্য হাত। আজ ভাগ্য প্রসন্ন নয়।

জলা পার হবার পর আর বেগ পেতে হয় নি। গ্রামের সরাই-খানায় পেঁছুতে পেঁছুতে ঘোর হয়ে আসে।

সরাই খানাটি গ্রামের মাঝখানে। কুকুর ঘেউ ঘেউ ক'রে ছুটে আসে। কুতূহলী গ্রামবাসীর ভিড় জমে। কেউ কেউ বাড়ী ফিরে যায়।

একটি বুড়ী বর্মী উনুনের ধারে বসে ছিল চুপচাপ। চায়ের কেটলি থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। মিঃ গুপ্ত অবিলম্বে তিন কাপ চায়ের অর্ডার দেন। অশোকাকে জিজ্ঞেস করেন,

"অশোকা, একটু চা খাবি ?"

গ্রামের পথে এসে অশোকাকে নামিয়ে দিয়েছিল অলোক। মিঃ গুপ্ত আর অলোকের কাঁধের ওপর ভর করে কোনরকমে হেঁটে এসেছে সে। অবসন্ন দেহটি একটা খালি চারপায়ার উপর বিছিয়ে সে ধুঁকছিল, তাই পিতার কথার কোন জবাব দিতে পারলো না।

সৌমেনবাবুর মনে নতুন আশা জেগেছে। তিনি অশোকার উত্তরের আশা না করেই একের পর এক অর্ডার দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেশী বর্মী ভাষায় অনেকটা দখলও ছিল তার। কথাগুলোর তর্জমা করলে এই রকম দাঁড়ায়—

"এই বুড়ি, শীগ্‌গির রান্নাবান্নার ব্যবস্থা কর, চা দাও, জলখাবার যা থাকে দাও। শুকনো কাপড় চোপড় যা থাকে দাও। দোতালায় যদি ভাল ঘর থাকে তাহলে ঐ খানেই আমাদের শোবার ব্যবস্থা কর। শুধু ভাত আর মাছের ঝোল। আজকে রাতের মত আর কিছু না হলেও চলবে। গা হাত ধোবার ভাল সাবান চাই। তিনটে তোয়ালেও চাই। কি, উত্তর দিচ্ছ না যে?"

বুড়ী জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকে, কিন্তু কোন জবাব দেয় না।

অলোক বিরক্তভাবে বলে, "বদ্ধ কালা, দেখতে পাচ্ছেন না? আমাদের কোন বক্তৃতাই ওর কানে ঢুকবে না। টাকা বের করে দেখান, বুঝবে।"

মিঃ গুপ্ত পকেট থেকে একখানা দশটাকার নোট বার ক'রে বুড়ীর সামনে ধরলেন!

বৃদ্ধা এবার নড়ে চড়ে বসে। কিন্তু উঠবার কোন লক্ষণই নেই তার। শুধু দু'হাতের পাঁচটা করে আঙুল দেখায়।

ক্রুদ্ধ সৌমেন বাবু চীৎকার করে বলেন, "ওঠ শীগ্‌গির বুড়ি, নইলে মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব।"

ক্লান্ত অলোক ধমকের সুরে বাধা দেয়—"কেন মিছিমিছি বিপদ বাড়াচ্ছেন! এখুনি গ্রামশুদ্ধ লোককে ডেকে জড়ো করবে,

আমাদের কেটে কুচি কুচি ক'রে ফেললেও বিস্মিত হব না।” একটু থেমে আবার বলে, “ও টাকা বেশী চাইছে, বেশ ত বলুন না টাকা দেব, আরো শীগ্‌গির ভাল ব্যবস্থা করে দিক।” অলোক নিজের পকেট হাতড়ে পাঁচখানা দশ টাকার নোট বার করে মিঃ গুপ্তের হাতে দেয়।

“একরাত্রি থাকার জন্যে এতো টাকা! সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! এ তো ঠকিয়ে নেওয়া। জুলুম!” মিঃ গুপ্তের চোখ কপালে ওঠে।

“আপনি একটু চুপ করুন দয়া ক'রে। হাকিমির সময় নয় এটা। ভুলে যাবেন না এটা বর্মা আর এদেশ বৃটিশের হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। সেটুকু আছে এখনো তাও যাবে।”...

বেশী টাকার আশা পেয়ে বৃদ্ধার ব্যবহার একেবারে বদলে যায়। যেন ভক্তিমতী গৃহকর্ত্রী। পাশের ঘরে ছুটে গিয়ে কর্কশ স্বরে ডাকতে সুরু করে—“মং বা, মং বা।” মং বা অর্থাৎ বুড়ীর ছেলে তখনও ঘুমে অচেতন। বুড়ী সাতবার চীৎকার ক'রে ডেকেও যখন ছেলের ঘুম ভাঙ্গাতে পারলো না তখন এক বালতি জল ঢেলে দিল মং বার চোখে।

বিপর্য্যয় মোটা ছেলে মং বা। বয়েস বেশী নয়, বাইশ তেইশ হবে। এখনও বিয়ে হয় নি। কোন মেয়ে নাকি তার মত মুটকুশকে বিয়ে ক'রতে রাজী ছিল না সে গ্রামে। দুঃখে, অপমানে তাই সে দিনদিন মুটিয়ে চলেছিল। সে কেবল খায় আর ঘুমোয় আর বুড়ী বক্‌বক্ করে। যখন মায়ের বকুনীর মাত্রা সাঙ্ঘাতিক রকম আক্রমণাত্মক হ'য়ে ওঠে তখন আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়ে একটা নতুন লুঙ্গি আর গেঞ্জী প'রে। খানিকটা এগিয়ে সে নেমে যায় নদীর দিকে। সেখানে একটা শালগাছের নীচে চুপচাপ বসে থাকে খানিকক্ষণ। তারপর লুঙ্গীর ফাঁক থেকে বের করে বাঁশের বাঁশী। সুন্দর বাঁশী বাজায় মুটকুশ। কিন্তু আক্ষেপের কথা এই, সে বাঁশীর সুর এত দিনেও

কোন সুন্দরীর মনে আলোড়ন জাগায় নি। অসম্ভব মোটা, কিম্ভূত-কিমাকার মূর্তি তার।

"কি ব্যাপার মা ?"—চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসে মং বা।

"শীগ্‌গির ওঠ্, এরা সব এসেছেন। উপরতলা থেকে জামাকাপড় বিছানা বালিশ নামিয়ে আন্।"

মা ও ছেলে দু'জনে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়! ভেতরে একটা উঠোন। পশ্চিমদিক একটা দোতালা কাঠের বাড়ী।...

বুড়ী কাপে চা ঢালে। চা খেয়ে চারপায়ার ওপর উঠে বসে অশোকা। তার মনে হয় জ্বরটা যেন অনেক কমে গিয়েছে।

মং বা কুঁৎকুঁতে চোখে অশোকার দিকে তাকিয়ে আছে। অশোকার ভয় হয়। বর্মা সম্বন্ধে তার অনেকদিনের অভিজ্ঞতা। বর্মী জংলীদের সম্বন্ধে যে সমস্ত লোমহর্ষণ কাহিনী শুনেছে তাতে তার মনে ভরসা জাগে না।

এ গ্রাম কি নিরাপদ ?

মং বার চোখে কিসের ইঙ্গিত ?

আজ রাত্রেই যদি বাবাকে আর অলোক বাবুকে ঘুমন্ত অবস্থায় কেটে ফেলে মং বা ? তার অবস্থা কি হবে তখন ? অশোকা আশঙ্কায় শিউরে ওঠে। প্রবল জ্বরের তাড়নায় তার চেতনা ক্রমশঃ লোপ পায়।

—দশ—

অশোকার আশঙ্কা অমূলক। মং বা প্রকৃতপক্ষে নিরীহ প্রকৃতির। অশোকার মতন সুন্দরী মেয়েও কোনদিন তাদের সরাইখানাতে আসে নি। আশ্চর্য! মং আর আগেকার মতন দিনরাত পড়ে পড়ে ঘুমোয় না। তাকে সব সময় আজকাল কর্মব্যস্ত দেখা যায়।

জঙ্গল থেকে নানারকমের গাছ গাছড়া এনে অশোকার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে। বাজার থেকে বার্লি নিয়ে আসে। লেবুও জোগাড় করে আনাচে কানাচে এর বাগান ওর বাগান খুঁজে। অশোকা যেদিন অন্নপথ্য করে সেদিন আনন্দে মং বার কুৎসিত মুখখানাও ক্ষণেকের জন্যে সুন্দর দেখায়।

অশোকা একটু লজ্জিত হয় মং বার ওপর প্রথম দিনে অবিচার ক'রেছে ভেবে। মং বা না থাকলে এই অসুখ তাকে যথেষ্ট ভোগাতো সন্দেহ নেই। গ্রামে না আছে হাসপাতাল, না আছে ডাক্তার। জংলী হলেও মং বা গাছগাছড়ার সন্ধান রাখে ও অনেক মুষ্টিযোগ জানে। কয়েকদিন পর। অশোকা সম্পূর্ণ ভাবে সেরে উঠেছে। স্নান সেরে বর্মী পোশাকে সে বেরিয়ে পড়ে গ্রামের পথে। তাকে দেখতে পেয়ে গ্রামের কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে জড়ো হয়ে যায়। সে কারুর গাল টিপে দেয়, কারুর মাথার চুলের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে চুল উস্‌কে দেয়। সরল বালকবালিকা তার সঙ্গে চলে গ্রামের বৌদ্ধ মন্দির প্যাগোডার দিকে। প্যাগোডার পুরোহিতরা গম্ভীর কণ্ঠে কি যেন পাঠ করছিল, বেশ লাগে শুনতে। প্যাগোডার বাগান থেকে ফুল তুলে অঞ্জলি দেয় অশোকা, বুদ্ধমূর্তির সামনে প্রণাম জানায়।

ফেরবার পথে প্রতিবাড়ী থেকে ছেলেমেয়েরা নাচতে নাচতে আসে ফুলের উপহার নিয়ে। এমন সুন্দরী মেয়ে! বুদ্ধের দেশের মেয়ে! কি চমৎকার বর্মী ভাষায় তাদের সঙ্গে কথা বলছে! ছেলেমেয়ের দল অল্পসময়ের মধ্যেই অশোকার অনুগত ভক্তবৃন্দে পরিণত হয়ে ওঠে।

এদের সঙ্গে রোজ বেড়াতে সুরু করে অশোকা। একদিন গ্রামের স্কুলটাও দেখে আসে, বর্মী পোশাকে তাকে মানিয়েছেও বেশ। ফুঙ্গী বুড়ো লিং চিং চীনা ভাষায় লেখা অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতের অনুবাদ থেকে খানিকটা তর্জমা করে শোনান এবং হাসিমুখে অশোকাকে বিদায় দেন।

রাত্রে মিঃ গুপ্ত ও অশোকা দোতালার ঘরে শোয়। অলোক নীচের তলায় চওড়া বারান্দায় মশারীর মধ্যে আশ্রয় নেয়। প্রথম প্রথম অলোকের জন্য অশোকা শঙ্কিত থাকত খুবই। কি জানি জংলী বর্মীটা কি করে বসে? কিন্তু এখন আর তার মনে কোন সংশয় নেই।

একদিন কিছু ফুল তুলে এনে উপহার দেয় মং বাকে অশোকা। মংএর চোখে খুশির বন্যা বয়ে যায়। নাচতে নাচতে সে গান গায় কিছুক্ষণ, তারপর কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় কয়েক ঘণ্টার জন্য।

বিকেলে একটি সুন্দর বাঁশের বাঁশী তৈরী করে এনে সে অশোকাকে প্রতিদানে উপহার দেয়। অশোকা বাঁশীটা নেড়ে চেড়ে দেখে, বলে—

"আমি তো বাঁশী বাজাতে জানি না।"

মং বার ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই শুধরিয়ে নিয়ে বলে, "ভারী সুন্দর বাঁশীটি কিন্তু, আমি আজ থেকে বাঁশী বাজাতে শিখব। শেখাবে আমাকে মং?"

মংএর অবস্থা তখন কাহিল। সে যে কি করবে ভেবেই পায় না। পাশের ঘরে ছুটে গিয়ে নিজের বাঁশীটি হাতে নিয়ে আসে এবং বিকট

অঙ্গভঙ্গী সহকারে অশোকাকে বাঁশী বাজানো শেখাবার প্রচেষ্টায় রত হয়।

কিছুতেই কিন্তু অশোকা বাজাতে পারে না। মং অবশেষে বাঁশীর ছিদ্রপথ টিপে ধরে, কসরত করে অনেক, উপদেশ দেয়। শেষমেষ ক্লান্ত অশোকা বলে—

"মং! আজকে এই পর্যন্ত থাক, কেমন? কাল আবার শেখা যাবে। একদিনে তো সব কিছু শেখা যায় না।"

মং মাথা দোলায়! অশোকার সব কথাই সে মেনে নেয় বিনা প্রতিবাদে।

পরদিন বিকেলবেলা।

...বৃদ্ধা লাওসিটা রান্নাঘরে কাজ করে। মং নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছে। মিঃ গুপ্ত গালে হাত দিয়ে বসে কি ভাবছেন!

"বাবা, তুমি এত ভাবছ কেন?"—অশোকা এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে।

চিন্তিতভাবে চোখ তুলে চান মিঃ গুপ্ত। মেয়ের দিকে একনজর চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভগ্নস্বরে বলেন—

"দেশে ফিরে যাবার কোন উপায় তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।"

অলোক কিছুদূরে চারপায়ার উপর চোখ বুঁজে শুয়েছিল। উঠে এসে যোগ দেয়—

"জলপথে আমরা মিনবুর কাছাকাছি যেতে পারি, খানিকটা হেটে মিনবু পেঁৗছুতে পারলে বেসিনে যেতে আমাদের কোন অসুবিধে হবে না। এক সপ্তাহ সময় লাগবে। ঘাটে একটা মাত্র মাঝি আছে। কিন্তু সে অনেক টাকা চায়।"

"কত টাকা?"

"একশো।"

"একশো টাকা! কি বলছ, আমাদের কাছে এখন পাঁচ পয়সাও নেই। বুড়ী জানতে পারলে কাল থেকে খাওয়া বন্ধ করবে।"

অশোকা চুপ করে থাকে। মিঃ গুপ্ত অলোককে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন ফুঙ্গীর কাছে খবর নিতে। ফুঙ্গী কিছু টাকা ধার দিতে বা অন্য কোন উপায়ে তাদের সাহায্য করলেও করতে পারেন। দেখা যাক একবার চেষ্টা করে।

সরাইখানার অন্দর মহলের দিকে পা বাড়ায় অশোকা। মই বেয়ে উপরে উঠে সাবধানে। এখনও শরীরটা যেন একটু দুর্বল, মাথা ঘুরছে।

উপর তলায় ঘরের মধ্যে স্তূপাকৃতি সেলাই করা জামাকাপড় ছড়ানো। সকালে লাওসিটার কাছ থেকে সূঁচ-সূতো ধার করে নিজের শাড়ী ব্লাউজ, অলোকের ও বাবার পোশাক আশাকগুলি যথা সম্ভব রিপু করে নিয়েছে। কলাগাছের ছাই থেকে তৈরী ক্ষার দিয়ে কেচেও নিয়েছে। মোটামুটি ভাবে। ঝরণার জলটা ভাল, সাবানে অথবা ক্ষারে হাত জড়িয়ে যায় না।

একটি একটি করে গুছিয়ে তোলে জামা কাপড়গুলি। গুন্‌গুন্‌ গান গায়। জানালাগুলো একে একে খুলে দিয়ে বিছানার উপর এসে বসে।

মুক্ত জানালা দিয়ে দমকা বাতাস হানা দেয়। শিথিল কবরী এলিয়ে পড়ে পিঠের উপর। ঝোপ ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় প্যাগোডার স্বর্ণাভ চূড়া।...

আকাশে আবিরের ছটা। মনের গহনে অচেনা শাখানদীর জলকল্লোল।

—এগারো—

দরজার পাশে কার যেন ছায়া পড়েছে। অশোকা ফিরে তাকায়। মং দাঁড়িয়ে, হাতে তার একটা বিরাট চিতল মাছ। মংএর থ্যাবড়া নাক আনন্দে আরও চওড়া দেখায়।

অশোকা হেসে বাইরে আসে। কোন কথা না বলে দুজনে নেমে আসে। ইঙ্গিতেই বুঝে নিয়েছে মংএর মনের কামনা।

লাওসিটাকে সম্বোধন করে বলে, "তোমার ছেলেটি দেখছি একজন যাদুকর। ছাই দিয়ে বেশ করে ঘষে মাছটা পরিষ্কার কর। আঁষ ছাড়িয়ে কুটে ফেল। রান্নার সময় আমাকে ডেকো। আমি আজ বাংলাদেশের রান্না খাওয়াব তোমাদের সবাইকে।"

ছোটছেলের মতন হাততালি দিয়ে নাচতে সুরু করে মং। লাওসিটা ভ্রূকুটি করে। অতিথিদের অসন্তুষ্ট করা উচিত নয়। একমাসে অশোকাদের কাছ থেকে এত টাকা পেয়েছে যে সারা বছরে তার অর্দ্ধেক আয় করেছে কিনা সন্দেহ।

আড়ালে গজ্‌গজ্ করে লাওসিটা। "গর্দ্দভ! এতবছর ধরে রেঁধে খাওয়াচ্ছি ওকে! গাঁয়ের সকলেই জানে বুড়ী লাওসিটার মতন রাঁধুনী নেই! আর ও কিনা ছুড়ীর মুখের কথায় ভুলে গেল।"

অলোক ও মিঃ গুপ্তের প্রতীক্ষায় অশোকা একটা টুল টেনে নিয়ে বসে সরাইখানার সামনের মাঠটায়। একটু পরে মং বা সেখানে এসে উপস্থিত হয়। পোষা কুকুরের মতন শান্তভাবে অশোকার পায়ের কাছে বসে পড়ে।

"মং! আমার গলার হারটা আর হাতের চুড়িগুলো বিক্রী করে কিছু টাকা জোগাড় করে দিতে পার?"

বিস্মিত মং প্রশ্ন করে, "কেন ?"

"আমার দুশো টাকার দরকার। আমাদের কাছে যা টাকা ছিল তা সব ফুরিয়ে গেছে। বেসিন পর্যন্ত পৌঁছুতে দুশো টাকা লেগে যাবে।"

"বেসিন! তোমরা কি চলে যেতে চাও?" মুহূর্তে মংএর মুখটা ম্লান হয়ে যায়। ছোট ছেলের মতন অভিমান ক'রে সে দুই চোখ ঢাকে। বাইরের জগৎ কি তা বুঝবার ক্ষমতা নেই তার। অশোকাই প্রথম নারী যার স্নেহস্পর্শ সে জীবনে সর্বপ্রথম লাভ করেছে। এর আগে সবাই তাকে নিয়ে কেবল ঠাট্টা বিদ্রূপই করে এসেছে।

কারা যেন আসছে হারিকেন লণ্ঠন হাতে। অশোকা চেয়ে দেখে মিঃ গুপ্ত ও অলোক, সঙ্গে পনের-ষোল বছর বয়েসের একটি ছিপছিপে ছোকরা পথ দেখিয়ে আসছে। ফুঙ্গী ভদ্রতা ক'রে সঙ্গে একটি ছোকরাকে দিয়েছেন। রাত্রে সাপখোপের ভয় আছে। গ্রামের মধ্যে কিছুদিন আগে মিং শান সাপের কামড়ে মরেছে। তাই আলো ছাড়া আসতে দেন নি তিনি।

অদ্ভুত দৃশ্য! ক্রন্দনরত মংকে দেখে বিস্মিত মিঃ গুপ্ত প্রশ্ন করেন—"কি হয়েছে রে অশোকা ?"

অশোকা শান্ত ভাবে উত্তর দেয়—"আমরা চলে যাবো বলে মং কাঁদছে।"

ফুঙ্গী প্রেরিত ছোকরাটি মংকে লক্ষ্য করে কি যেন ছড়া কাটে, হাততালি দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মং কান্না থামিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলেটির উপর। গলা টিপে ধরে। অলোক বাধা না দিলে ছেলেটির দফা শেষ করেছিল আর কি! মংএর চোখে হিংস্র বন্যপশুর দৃষ্টি!

অশোকা তিরস্কারের সুরে মংকে সম্বোধন করে বলে—"কি বলেছে তোমায় যে তুমি গলা টিপে ধরলে ? ছিঃ! তুমি না বয়সে বড় ?

ওরকম ভাবে গলা টিপে ধরা তোমার কি উচিত হয়েছে? আর একটু হলেই ও মরে যেত।"

মং মুহূর্তে শান্ত হয়ে আসে। বোকার মতন হেসে উত্তর দেয়—"ও কেন আমায় কুমীর বলবে? আমি কি কুমীর? শকুনও নয় আমি। আমাকে বিয়ে করবে না কোন মেয়ে। ও বলেছে ছড়া কেটে। আমার কি লেজ আছে? নেই তো! তবে ও কেন আমাকে বানর বলবে?"

অলোকের ঠোঁটে হাসি দেখা দেয়। অশোকা বাংলায় সাবধান করে দেয়, "এ অবস্থায় হাসবেন না কিন্তু! ওই আমাদের শেষ ভরসা। ওকে চটাবেন না। আমি বুঝতে পারছি আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হয় নি।"

ফুঙ্গী প্রেরিত ছোকরাটি চলে যায় গলায় হাত বুলোতে বুলোতে।

"মং একটা বিরাট চিতল মাছ ধরে এনেছে অলোকবাবু। আজ আমি রান্না করছি কিন্তু।"

অন্ধকারের মধ্যে অলোকের দৃষ্টির সঙ্গে অশোকার দৃষ্টি বিনিময় হয়। অশোকা এগিয়ে যায় রান্নাঘরের দিকে।

—বারো—

রাত তখনো কাটে নি, মং মায়ের ঘরে এসে দাঁড়ায় সন্তর্পণে। লাওসিটার নাক ডাকছে। গভীর ঘুমে অচেতন বুড়ী। এই সুযোগ।

যে টাকাগুলি বুড়ী অতিরিক্ত আদায় করেছে, অলোকদের কাছ থেকে সেগুলির মধ্যে থেকে গুনে গুনে দুশো টাকার নোট বের করে নেয় মং। তার পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত।

মং পথ দেখিয়ে চলে। মাঝখানে অশোকা ও মিঃ গুপ্ত, পিছনে বেহালা ও পুঁটলি কাঁধে অলোক অনুসরণ করে।

পথের বাঁক ঘুরলেই নদীর শাদা জল দেখা যায়। অশোকার মনে স্বপ্নের ছোঁয়াচ। পূর্ণিমা রাত। চাঁদের অলোয় পাহাড়ী গ্রামটি অদ্ভুত সুষমামণ্ডিত। ঝোপঝাড়, ধানের গোলা, মোষ গরু, ছাগলভেড়া, ঘোড়া, মুর্গী আর সোণালীরঙের প্যাগোডা সবই যেন আধোছায়া আধো-আলো রাত্রির মায়ায় বদলে গিয়েছে সম্পূর্ণভাবে। এমন একটি আবেষ্টন যেখানে হঠাৎ ভুলে যেতে হয় বর্তমান ও অতীত, হয়তো নিজেকেও ভুলে যেতে হয় তখনকার মতো।

বৌদ্ধ মন্দিরের দিকে ফিরে তাকাতে অশোকার স্মরণ হয় কপিলা-বস্তুর রাজপুত্রের কথা। ভারতবর্ষ বিদায় দিয়েছে শাক্যমুনির ধর্মকে, কিন্তু তা ছড়িয়ে পড়েছে সারা এশিয়ায়, এখনো তাই ভারতবাসী সহজেই আত্মীয়তা স্থাপন করতে পারে এই সব দেশে।

ঐতো সাম্পানের আলো জ্বলছে নদীর জলে! লুঙ্গিপরা মাঝিটাকে দূর থেকে পরিষ্কার চেনা যায় না। সে বোধ হয় ভাত রেঁধে এই মাত্র খাওয়া শেষ ক'রল। এই বুঝি নৌকোর খোলের জল সেঁচতে আরম্ভ করবে!

আরও এগিয়ে যে আমগাছটার ডাল ঝুঁকে পড়েছে পথের উপর তার নীচে পৌঁছুতেই অশোকা চীৎকার করে ওঠে। গাছ থেকে একটা সরু লিকলিকে সাপ অশোকার কাঁধের উপর ঝুপ করে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে অশোকার গলা পেচিয়ে হিস্ হিস্ শব্দ সুরু করে দেয়।

মং চেঁচিয়ে ওঠে, নড়তে বারণ করে। অশোকা ভয়ে চোখ বোজে। মিঃ গুপ্ত ও অলোক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকেন। আর একটু হলে অলোক সাপটাকে ধরবার জন্য হাত বাড়িয়েছিল, মং ক্ষিপ্রগতিতে অলোককে ঠেলে সরিয়ে দেয়। অদ্ভুতভাবে নাচতে নাচতে আর মন্ত্র পড়তে পড়তে অশোকার পাশে সরে যায়। সাপটা যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতন মংএর দিকে তাকিয়ে থাকে ও মাথা দোলায়। হঠাৎ সুযোগ বুঝে সাপটার ফণাটা পিছন থেকে এমন কৌশলে ধরে ফেলে যে ছোবল দেওয়ার আর কোন উপায় থাকে না।

সাপের আলিঙ্গন থেকে মুক্তি পেয়ে অশোকা পিতার বুকের মধ্যে আশ্রয় নেয়। ভয় তার বুকে তখনো হাতুড়ি পিটছিল ভয়ঙ্করভাবে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ পিছল পথে মং বা হড়কে পড়ে যায়। আঘাত পেয়ে সাপটা মংএর বাহাতে বসিয়ে দেয় বিষদাঁত।

অশোকা চীৎকার করে ওঠে। কিন্তু মং উঠে দাঁড়িয়ে সাপটাকে খপ্ করে ধরে ফেলে আবার। সগর্বভঙ্গীতে মাথা দুলিয়ে বলে সে একজন পাকা সাপুড়ে ওঝা—সাপের কামড়ে তার কিছুই হবে না। তাছাড়া এ জাতের সাপে নাকি তেমন বিষ নেই, সাপটাকে না মেরে জঙ্গলের দিকে ছুড়ে দেয় মং পরম অবজ্ঞায়। নিজের কাঁধের গামছাটা চিরে দুইভাগ করে বাঁধন দিয়ে দিতে বলে অলোককে। হাতের কব্জীতে একটা, আর কনুইএর উপর একটা। ঝোপ থেকে বেছে একটা জংলী আগাছার শেকড় তুলে নিয়ে চিবিয়ে খায়। ক্ষত স্থানটায় একটা চাকু বসিয়ে দিয়ে রক্ত বের করে ফেলে প্রচুর পরিমাণে।

রক্তের সঙ্গে নাকি অনেকটা বিষ বেরিয়ে যাবে, আর কিছু ভয় থাকবে না।

অশোকা বারবার অনুরোধ জানায় মংকে যেতে তাদের সঙ্গে। নিকটে কোন হাসপাতালে দেখিয়ে যদি কোন প্রতিকার পাওয়া যায়। মং শুধু মাথা নাড়ে। কোন দরকার নেই, এজাতের সাপের কামড়ে কিছুই হবে না। তাছাড়া হাসপাতালের ডাক্তাররা কি জানে চিকিৎসা? সাপেকাটা রোগীকে কোনদিন তারা বাঁচিয়েছে? হাসপাতালে গিয়েও তো কত লোক মারা যায়।...

মং সাবধান করে দেয়। আর দেরী নয়, তার মা যদি জেগে উঠে টের পায়, তাহলে লোকজন ডেকে জড়ো করবে। তখন অশোকাদের প্রাণে বাঁচিয়ে রাখা কঠিন হবে। মংএর কথায় কোন কাজ হবে না, গ্রামের কেউই তাকে গ্রাহ্য করে না। মং ভয় দেখায়।

অগত্যা সাম্পান ছেড়ে দেয়। অশোকা শেষবারের মতন মংকে তাদের সঙ্গে আসতে অনুরোধ জানায়। মাঝির হাঁকাহাঁকিতে অশোকার অস্পষ্ট কথাগুলো ঠিক শোনা যায় না।

নদীতে ভীষণ স্রোত। স্রোতের মুখে তাদের নৌকো ভেসে চলে তীরবেগে। সকালের সূর্যকিরণে আকাশে লাল আভা। ধীরে বাতাসের জোর বাড়তে থাকে। দূর থেকে কানে আসে করুণ বাঁশীর আওয়াজ।

অলোক দুঃখ করে বলে, "লোকটার জন্যে কষ্ট হচ্ছে। প্রথম দর্শনে মনে হয়েছিল আস্ত শয়তান কিন্তু শেষপর্যন্ত দেবদূতের মতনই আমাদের রক্ষা ক'রল দেখছি। আমার মনে হয় ও আমাদের ধোঁকা দিয়েছে। ওর বাঁশীর সুরে মৃত্যুর পদধ্বনি।"

নৌকোর দোলানির জন্য নড়ে চড়ে বসে অশোকা। জিজ্ঞাসা করে—"মানে?" তার চোখে উৎকণ্ঠা, কণ্ঠস্বরে আশঙ্কার রেশ।

"বর্মী সাপুড়েদের বহু পুরানো গানের সুর ধরেছে জংলীটা। কিন্তু এ গান মৃত্যুর গান, জীবনের নয়। হে ভুজঙ্গ! তুমি আমাকে

কামড়ালেও আমি গ্রাহ্য করি না। এমন যাদুমন্ত্র জানা আছে আমার যাতে করে সাপের বিষ নামিয়ে দিতে পারি। কিন্তু সে যখন চলে যাবে তখন বিষের ক্রিয়া রোধ ক'রব এমন শক্তি আমার কৈ ?"

মিঃ গুপ্ত ঘুমের ঝোঁকে ঢুলতে থাকেন। আকাশে দিনের আলোর প্রখরতা। নদীর দুই ধারে বড় বড় গাছের মাথায় পাখীরা কলরব করে উড়ে বেড়ায়। শুশুক নদীর জল তোলপাড় করে ওঠে আর ডুব দেয়। ছোট ছোট দ্বীপের ন্যায় চরের উপর কুমীর রোদ পোহায়। মাঝির বৈঠার শব্দে ঝপ্ করে লাফিয়ে পড়ে জলে, অদৃশ্য হয়ে যায়। গাঙচিল ছোঁ মেরে মাছ শিকার করে। দূরে উড়ে যায়। গাছের ডালের উপর বসে মাছটাকে ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে খায়। বিচ্ছিন্ন গ্রামগুলির পাশ দিয়ে নৌকো এগিয়ে চলে। বৌদ্ধ মঠ থেকে ঘণ্টার শব্দ মাঝে মাঝে কানে আসে।

কয়েকদিন কয়েক রাত নৌকোয় কাটাবার পর তাঁরা মিনবুর কাছাকাছি এসে পৌঁছায়। বহুবার অশোকা অনুরোধ জানিয়েছে অলোককে বেহালা বাজাতে; কিন্তু মিঃ গুপ্তের ভ্রূকুটি লক্ষ্য ক'রে অলোক অশোকার কথায় কান দেয় নি। আজ রাতটা কাটালেই সকালে মিনবু পৌঁছে যাবে তারা। মিঃ গুপ্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই অভ্যাস মত নাক ডাকান।...

জ্যোৎস্নাভরা আকাশটার দিকে একবার উদাসভাবে তাকায় অলোক। নদীর জল চক্‌চক্ করে। বয়ে চলেছে নৌকো। মাঝির বৈঠার শব্দের বিরাম নেই। বাঁশের চালির উপর অশোকা ঢলে পড়েছে ঘুমে। অশোকার দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অলোক। কি যেন ভাবে। তারপর বেহালাটা খাপ থেকে বের ক'রে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। অদ্ভুত অবস্থায় পড়ে ঐ সুন্দরী ধনীকন্যার সঙ্গে তার পরিচয়; কিন্তু এর

সার্থকতা কৈ ? আজ বাদে কাল বেসিন পৌঁছুলেই সব স্বপ্নই আকাশকুসুমে পরিণত হবে। নয় কি ?

মংএর বাঁশীর সুরই কি তারও জীবনে সত্য হয়ে উঠবে ? কোথায় ভবিষ্যৎ ? বর্তমান ও অতীত—সবই.তার কাছে ফাঁকা মনে হয়। একি মরুতৃষ্ণা ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে তার মনে ? কোথায় পরিণতি ? ছিঃ, ছিঃ, মেয়েটি যদি জানতে পারে, তাহলে যেটুকু শ্রদ্ধা সে এখনো পেয়ে আসছে ওর কাছ থেকে তাও আর থাকবে না। একেই সে গরীব, সামান্য রেলের কর্মচারী, তারপর লেখাপড়াও এমন বিশেষ কিছুই করতে পারে নি যে ভবিষ্যতে উন্নতি করবে, অশোকার যোগ্য হবে। এ শুধু দুরাকাঙ্খা, সভ্যতার আওতায় ফিরে গেলেই এমনকি তার শারীরিক সামর্থ্য ও বিপদের মধ্যে দুঃসাহসিক সাহায্য দানের মর্যাদাও কিছুই থাকবে না। ম্লান হাসির রেখা ঠোঁটের কোণায় মিলিয়ে যায়।

বেহালাটাকে অনেকদিন পর আলিঙ্গন করে ছড় টানতে সুরু করে অলোক। ক্রমে সুর তরঙ্গিত হয়, কেঁপে কেঁপে মিলিয়ে যায় বাতাসে, নদীর ছল্‌ছল্‌ ছলাৎ শব্দের মধ্যেও যেন সুরের প্রতিধ্বনি। গভীর নদী বয়ে চলেছে, মিশে যাবে নীল সাগরের জলে।

নদীর পাড়ে একটি ঝোপ থেকে কি একটা পাখী ডেকে ওঠে হঠাৎ। অশোকার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

একি সুধাবৃষ্টি ! সুরের পরশ।

এত সুন্দর বেহালায় হাত ওঁর !

বিস্মিতা যুবতীর বুকে জাগে নব-চেতনার অঙ্কুর।

—তেরো—

মিঃ গুপ্ত স্টিমারের হুইশিলে জেগে ওঠেন। সাম্পান ভীষণভাবে দুলতে থাকে। অন্যদিক থেকে গুণ টেনে একটা বিরাট হাজারমনী আসছিল। তার সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে বেঁচে যায়। চীৎকার, গোলমালে অলোকের ঘুম ভাঙ্গে। অলোক চোখ মুছে উঠে বসে।

মিঃ গুপ্তের হাঁক ডাক শোনা যায়। একবার যখন বেসিনে পেঁ ৗছে গেছেন আর ভাবনা কি? এবার সটান জাহাজে টিকিট কিনে ভারতবর্ষে ফিরতে পারবেন। টাকা পয়সা সঙ্গে নেই। নেই, নেই, একটা কিনারা হবেই হবে। তার মাসতুতো ভাই মিঃ এইচ, দে মণ্টগোমারী রাইসমিলের এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার। হৃষীকেশের দেখা পেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিছু টাকা ধার নিলেই হবে। কলকাতায় ফিরে পাঠিয়ে দিলেই হোল।

...মিঃ দে বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে একজন বর্মী ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। প্রথমে তিনি বুঝতে পারেন নি কারা এল। বুঝতে পেরে এমন হাঁকহাঁকি সুরু করে দেন যে দরোয়ান চাকর যে যেখানে ছিল সবাই এক একে ছুটে আসে কাজ ফেলে।

হৃষীকেশ বাবুর স্ত্রী বেরিয়ে আসেন। মেয়ে মীরা, ধীরা আর বড় ছেলে অমল—তারাও সাড়া পেয়ে বেরিয়ে আসে। অশোকাকে বুকের মধ্যে টেনে নেয় মীরা: "ইশ্, কি শ্রী হয়েছে তোর? একি অদ্ভুত পোশাক? কত বড় হ'য়ে গিয়েছিস রে?"

—"আর তুমি বুঝি ছোট্ট খুকীটি আছ?"

—"তা আমি তোর চাইতে দু'বছরের বড় তো বটেই।"

অশোকা মুচকি হেসে বলে, “দু’বছরের ছোট হওয়াটা তাহলে উচিত হয় নি দেখছি।”

মিঃ গুপ্ত ও হৃষীকেশবাবু গল্প করতে করতে বাড়ীর ভেতরে এগিয়ে যান। অন্যান্য সবাই অনুসরণ করে।

অলোক দরজার কাছে একা দাঁড়িয়ে থাকে। কেউই তাকে ঘরের মধ্যে আসতে আহ্বান জানায় না। অশোকারও খেয়াল ছিল না। আনন্দ ও উত্তেজনার মধ্যে অলোকের উপস্থিতির কথা সবাই ভুলে গিয়েছিল। এত বিপদ আপদের পর আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ। অলোক ভাবে—সব দিক খেয়াল না থাকাই স্বাভাবিক।

প্রথম সাক্ষাতের উত্তেজনা কাটিয়ে অশোকা যখন কাপড়চোপড় বদ্‌লে বৈঠকখানায় ফিরে আসে তখন তার চৈতন্য হয়। ' ইশ্‌! ভারি ভুল হ'য়ে গিয়েছে ত! চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নেয়—অলোকবাবু কোথাও বসে আছেন কিনা।

“কিরে কাকে খুঁজছিস্‌?” হৃষীকেশবাবু চুরুটটা মুখ থেকে নামিয়ে জিগ্যেস করেন।

অশোকা তাঁর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে মিঃ গুপ্তকে প্রশ্ন করে, “বাবা, অলোকবাবু কোথায়? তাঁকে ভেতরে ডাক নি? আমার একেবারেই মনে ছিল না।”

মিঃ গুপ্ত অস্বস্তি বোধ করেন। তখন-তখনি অবশ্য অলোককে বিদায় দেবার ইচ্ছা ছিল না তাঁর! ছেলেটি তাঁদের উপকার করেছে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ দৈবগতিকে। এ রকম বিপদে পড়লে মানুষ মানুষকে সাহায্য করেই থাকে। আর সেইটেই নিয়ম। মিঃ গুপ্তের বদ্ধমূল ধারণা অলোকের ত্রুটীর জন্যেই তিনি ট্রেন ফেল করেছেন যার জন্য তাঁর সমস্ত জিনিসপত্র লোপাট হ'য়ে গেল।

উঃ! অনেক টাকার গয়না, জিনিষপত্র, মোটর সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ধরতে গেলে এর জন্য দায়ী কে? অলোক যাই বলুক না

কেন, চাপরাশী নিশ্চয় মিঃ গুপ্তের আদেশ অমান্য করেনি। উদ্ধত, বেয়াড়া ধরণের ছোকরা মাস্টার—হয়তো মদের ঝোঁকে ছিল, খেয়ালই করে নি।

হ্যাঁ, বর্মার রেলওয়ে কর্মচারী মাত্রেই দুর্জন শ্রেণীর লোক, মদ খায় না, ঘুষ নেয় না অমন লোক খুঁজে পাওয়া ভার। তাছাড়া বেশীর ভাগেরই স্মাগলারদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

মিঃ গুপ্ত মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করেন। কি যেন চিন্তা ক'রে বলেন—"হৃষীকেশ, আমাকে শ' দুই টাকা ধার দিতে পার ?" তারপর একটু থেমে বলেন—"না, শ' পাঁচেক দাও।"

সকলেই মিঃ গুপ্তের দিকে তাকায়।

অশোকা অধীরভাবে বলে—"বাবা, তুমি কি ব'লছ ? অলোকবাবু বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা তাঁর কোন খোঁজই নিই নি। তোমার টাকার কথা তুমি পরে ব'লো।"

মিঃ গুপ্ত নীরবে চুরুট টানেন, কোন উত্তরই দেন না। তাঁর জন্য অপেক্ষা না করে অশোকা এগিয়ে যায় গেটের দিকে।

অলোক তখনো ভাঙ্গা বেঞ্চটার এককোণে বসে। তার কোলের উপর বেহালার বাক্স। তোয়ালে জড়ানো কাপড়ের পুঁটলিটা এককোণে মাটিতে নামানো। হৃষীকেশবাবুর বাড়ী থেকে নদী দেখা যায়—নদীর জলের দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়েছিল অলোক। অশোকার চটিজুতোর শব্দে ফিরে চায়।

উঠে দাঁড়িয়ে হেসে অভিবাদন জানায়। পোষাক বদলে, স্নান করে, প্রসাধনের কৃপায় অশোকার চেহারা যেন একেবারেই নতুন হয়ে গিয়েছে। এখন তাকে ভদ্রমহিলা বলে মনে হয়, তুমি বলে সম্বোধন করবার সাহস আর অলোকের নেই।

যখন তাদের প্রথম দেখা হয় রাত্রির অন্ধকারে বিদ্যুতের ক্ষণিক আলোকে তখন অলোকের মনকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করেছিল জাপানী

আক্রমণের আকস্মিকতা। কিন্তু বেসিনের মতন বন্দর শহরে যেখানে বৃটিশ কর্তৃত্ব তখনো অটুট, আকাশে এরোপ্লেন উড়ছে, সমুদ্রের উপর রণ-জাহাজ টহল দিচ্ছে, সেখানে আই, সি, এস ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়েকে অগ্রাহ্য করবার উপায় নেই। তকমা-আঁটা চাকরবাকর চারিদিকে, ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের আবেষ্টনে কি বলে সুবেশা তরুণীকে সম্বোধন করবে ভেবেই পায় না অলোক। অনেক কষ্টে ঢোঁক গিলে বলে—"আজকে তাহলে আসি। মিঃ গুপ্ত এতক্ষণে আশ্বস্ত হয়েছেন নিশ্চয়ই। আপনার সঙ্গে দেখা করে যাব বলে এতক্ষণ বসেছিলাম।—আমাদের কথা কি মনে পড়বে আপনার? কলকাতায় গিয়ে হয়তো সব কথাই ভুলে যাবেন। কিন্তু—কিন্তু...হ্যাঁ বলছিলাম—আচ্ছা, এবার তবে আসি, কেমন?"

অশোকা হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই সত্বা যার চেয়ে প্রিয় আর কিছুই নেই অশোকার কল্পজগতে; কিন্তু নারীর লজ্জা—দুর্লঙ্ঘ্য বাধা।...কত কি বলবার ছিল কিন্তু—।

"আপনি চলে যাচ্ছেন কেন? আপনাকে এখানে বসিয়ে রাখার জন্য আমরা বিশেষ লজ্জিত। এতদিন পর এদের দেখা পেয়ে কোন কিছু খেয়াল ছিল না। সেইজন্য আপনার কাছে মাপ চাইছি।"

একটু থেমে আঁচল নিয়ে খেলা করতে করতে পুনরায় বলে—

"ভিতরে আসুন, কাপড়চোপড় বদলান। বাবা, কাকা, সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা ক'রছেন, আসুন।"

এবার সহজ হাসিতে অলোক উত্তর দেয়—"না না, আপনাদের ব্যস্ত হবার কারণ নেই। আমি কিছুই মনে করি নি। এরকম অবস্থায় ভুলচুক একটু আধটু হয়ে থাকে।"

অশোকা পুনরায় আহ্বান জানায়—"আসুন।"

অলোক অস্বীকার করে, বলে—"এখানে আমার একজন আত্মীয় থাকেন—ঠিক যাকে আত্মীয় বলে তা না হলেও আত্মীয়ের অধিক।

অনেকবার কথা দিয়েছি বেসিনে এলে তাঁর ওখানেই উঠব। এখন যদি সেখানে না যাই জানতে পারলে তিনি ভয়ানক দুঃখিত হবেন।"

অলোকের কথা শেষ হতে না হতে মিঃ গুপ্ত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। পিছন পিছন হৃষীকেশবাবু, তাঁর মেয়েরা, স্ত্রী—সবাই এসে ভিড় করে দাঁড়ান। কে সে ভদ্রলোক যার জন্য অশোকা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল? হৃষীকেশবাবুর বড় মেয়ে মীরা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অলোক ও অশোকাকে লক্ষ্য করে।

মিঃ গুপ্ত আপনার স্বাভাবিক কর্কশস্বরে আরম্ভ করেন—"দেখ অলোক! তোমার কথা ভুলে গিয়েছিলাম গোলমালে। তুমি আমাদের যা উপকার করেছ সেজন্য এঁরা সবাই তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন। এই পার্সটা রাখো। যদি কলকাতা যাও আমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রো—দেখি আরো কিছু ক'রতে পারি কিনা তোমার জন্য। আর হ্যাঁ, কি যেন বলছিলাম, হ্যাঁ—ভেতরে এসো। বাড়ীর মেয়েরা বলছিলেন—তোমার বিশ্রাম দরকার। স্নান টান ক'রে কিছু খেয়ে যাও। হ্যাঁ হে, এখন তুমি কি ক'রবে ঠিক করেছ? তোমার কোন বন্ধুবান্ধব আছে নাকি এখানে?"

বাবার দীর্ঘ বক্তৃতা শুনতে শুনতে অশোকার মুখ ক্ষোভে অভিমানে লাল হয়ে ওঠে। টাকা বকশিস্! একজন ভদ্রলোকের ছেলেকে টাকা বকশিস্ দিতে যাওয়া মানে অপমান করা এই সহজ বোধটুকু কি বাবা হারিয়ে ফেলেছেন?

অশোকা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখে অলোক হাত বাড়িয়ে টাকা নিচ্ছে।

আশ্চর্য! নোটগুলো গুনে নেয়, বুক পকেট থেকে নোটবুক বের ক'রে কি যেন লেখে। হাত জোড় ক'রে সকলকে নমস্কার করে। ধন্যবাদ জানিয়ে বলে আতিথ্য স্বীকারের সৌভাগ্য থেকে আপাততঃ বঞ্চিত হ'তে হবে তাকে। বিশেষ জরুরী কাজ আছে তার।

বেহালার বাক্সটা ডান বগলে উঠিয়ে পুনরায় নমস্কার ক'রে সবাইকে। তারপর হনহন্ ক'রে গেট পার হ'য়ে রাস্তায় চলতে চলতে ভিড়ের সঙ্গে মিশে যায়।

অশোকার মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরোতে চায় না। কে যেন তার কণ্ঠ রোধ ক'রে রেখেছিল এতক্ষণ। গাঢ় স্বরে বলে, "অলোক-বাবুকে অপমান করলে কেন বাবা?" আবেগে কণ্ঠস্বর কাঁপে। উত্তরের জন্য আর দাঁড়ায় না সে।

—চৌদ্দ—

অশোকা চলে যেতে মিঃ গুপ্ত আশ্চর্য হ'য়ে বলেন, "দেখলে তো! ওকে আবার অপমান করলাম কখন! নাঃ, মেয়েটার মাথার গণ্ডগোল হ'য়েছে দেখছি। ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ার এফেক্ট।"

কারুর সমর্থন না পেয়ে চুরুটের ছাই ফেলেন, বাড়ীর ভিতর যেতে যেতে বলেন, "অবশ্য অল্প বয়েস অশোকার, কৃতজ্ঞতা থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু আসল ব্যাপারটি তো ও বুঝলে না।"

চুরুটের ছাই ফেলে পুনরায় সুরু করেন—"লোকটা বদ একথা বলছি না। কিন্তু তোমরা সবাই তো জানো—কি চরিত্রের লোক আসে বর্মার রেলে কাজ করতে। যত বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো বখাটে বাঙ্গাল, এরাই কাজ নেয় রেলে। একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছ কিনা জানি না; লোকটি টাকা পেয়ে বেশ খুসী হয়েছে। এত টাকা আশাই করে নি মাস্টার। গুনে গুনে টাকাগুলো নিল। অশোকা বলে কিনা অপমান করলাম। মাথা খারাপই হয়েছে মেয়েটার।"

কিছু বুঝতে না পারলেও সকলেই এক মনে শুনছিল। মিঃ গুপ্ত আবার সুরু করেন, "অশোকা যে ছোকরাকে ভদ্রলোক ভেবেছে সে অশোকার ভদ্র মনের পরিচয়। কিন্তু ওরা যে কি শ্রেণীর ভদ্র তা হৃষীকেশ তুমিও জানো, আমিও জানি।"

ততক্ষণে তাঁরা ড্রয়িংরুমে এসে বসেন। মিঃ গুপ্ত চুরুট ফেলে দিয়ে হৃষীকেশবাবুর রূপোর কেস থেকে একটা সিগারেট বের করে মুখে দেন। পরপর তিনটে কাঠি নষ্ট ক'রবার পর সিগারেট ধরাতে সমর্থ হন।

"হ্যাঁ, কি বলছিলাম? ছোকরাকে যতটা বেহিসেবী ভেবেছিলাম ঠিক ততটা বেহিসেবী নয় কিন্তু। কাজের ছেলে, দেখলে না, কিছু

পাবার জন্য আশা করে বসেছিল এবং শেষ পর্যন্ত আদায় না করে উঠল না।”

হৃষীকেশবাবু বেশ বলিষ্ঠ ধরণের মোটাসোটা ভদ্রলোক। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। জীবনে সাফল্যই অর্জন করে এসেছেন। কোনদিনই মনস্তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামান নি। তিনি এতক্ষণ ভেবে পাচ্ছিলেন না, অশোকাই বা কেন নাটকীয় ভাবে চলে গেল রুদ্ধ আবেগে, আর সৌমেনদাই বা কেন এত দীর্ঘ কৈফিয়ৎ দিয়ে চলেছেন।

তাঁর কাছে ব্যাপারটায় কোন সমস্যাই নেই। সৌমেনদা যদি মনে করে থাকেন মাস্টার যে সাহায্য করেছে তার দাম পাঁচশ টাকাই—ব্যস, হিসেব তো চুকেই গেল। হৃষীকেশবাবুর মতে টান ও যোগানের নীতি দ্বারা সব মূল্যকে নির্দ্ধারিত করা উচিত। ধান চালের মূল্য নির্দ্ধারণে যে নীতি খাটবে সেই নীতি অন্য সব ক্ষেত্রেই খাটবে কিনা—সূক্ষ্ম ব্যাতিরেকের জন্য মাথা ঘামাতে কোন দিনই হৃষীকেশবাবু রাজী নন।

“আসল ব্যাপার কি জানো সৌমেনদা, আজকালকার ছেলেমেয়েরা একটু বেশীমাত্রায় সেণ্টিমেণ্টাল হয়ে উঠেছে, সিনেমা দেখে আর নভেল পড়ে। সব ব্যাপারেই এরা নাটক খুঁজে বেড়ায়।”

একটু থেমে সিগারেট ধরান, তারপর বলে চলেন টানের ফাঁকে ফাঁকে—“আমি কিন্তু ঠিক করেছি আর দেরী ক’রব না। ছুটির দরখাস্ত করেছি, দেশে ফিরেই প্রথম কাজ হবে মীরাকে ও ধীরাকে বিয়ে দেওয়া।”

মীরা হৃষীকেশবাবুর বড় মেয়ে। বয়েস উনিশ কুড়ির মাঝামাঝি, প্রাইভেটে বি, এ পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছে। বাবার পাশে ব’সে বিনা প্রতিবাদে সব কথা শুনে যায়। মৃদু মৃদু হাসে।

মীরার ছোট ধীরা আমুদে সাদাসিধে ধরণের, বছর পনেরো বয়েস হবে কিনা সন্দেহ। সে অশোকার পিছন পিছন উপরে উঠে গিয়েছিল।

চুপিচুপি মীরার কানে বলে—"দিদি, শীগ্‌গির এস, মেজদি ওপরে জানালার কাছে গালে হাত দিয়ে বসে আছে, কোন কথাই বলছে না।"

অশোকার ভাবান্তরের সত্যিকারের কারণ অন্য কেউ না বুঝলেও মীরা খানিকটা আন্দাজ ক'রে নিয়েছিল। অশোকার মুখের অস্বাভাবিক বিবর্ণতা তাকে বিস্মিত করেছিল যেমন, ঘটনার পরিণতিতে চিন্তিতও সে হয়েছিল অনেকখানি।

মিঃ গুপ্তের আই সি এস উন্নাসিকতায় তার কোন দিনই সায় ছিল না মনে মনে। অবশ্য পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা সে তখনো জানতে পারে নি। তবে অপরিচিত ভদ্রলোকটি যে বকশিস্ পাওয়ার জন্য বসেছিল না, সেটা বুঝতে তার এক সেকেণ্ডও লাগে নি। নোটগুলো হাত বাড়িয়ে নেবার সময় ভদ্রলোকটির কান দুটি যে অপমানে লাল হয়ে উঠেছিল সেটা সহজেই সে অনুভব করে নেয়। ধীরার কথায় উদ্বিগ্নভাবে উঠে যায় তৎক্ষণাৎ।

মীরার মা হরিপ্রিয়া দেবী ততক্ষণে রান্নাঘরের কাজকর্মের তদারক করতে সুরু করেছেন, মালাও জপ ক'রছেন। সিলেটের মেয়ে, পরম বৈষ্ণবকন্যা, কত হাজার বার নাম জপ শেষ না হলে জলস্পর্শ করেন না, এইরূপই জনশ্রুতি বন্ধুবান্ধব মহলে প্রচলিত। আজকালকার মেয়েদের হাবভাব তাঁর মোটেই পছন্দ নয়, কিন্তু তিনি নিরীহ স্বভাবের, মুখ ফুটে কিছু বলেন না কোনদিন।

ধীরাকে ও মীরাকে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে দেখে জপ থামিয়ে প্রশ্ন করেন—"হ্যাঁরে মীরা, অশোকার ব্যাপার কিরে? কিছুই তো বুঝতে পারলাম না।"

মীরা মৃদু হেসে বলে—"আমিও কিছু বুঝে উঠতে পারিনি এখনো। ওর সঙ্গে কথা বলে দেখি, তারপর ব'লব তোমায়।"

মীরা ও ধীরা চঞ্চলগতিতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায়।

...এদিকে বৈঠকখানায় হৃষীকেশবাবু তখনো বকে চলেছেন—"ইংরেজ একটা জাত বটে। জানো সৌমেনদা, বড়সাহেব বলে কিনা, এরকম যুদ্ধ ইংরেজরা বহুবার দেখেছে এবং কাটিয়ে উঠেছে। জার্মানী যদি ইংলণ্ড কেড়েও নেয়, যুদ্ধ থামবে না কিন্তু। মিঃ এ্যানস্টি বল্লেন, কানাডা থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সব ব্যবস্থাই নাকি এর মধ্যেই ঠিক হয়ে গেছে।"

.একটু থেমে, সিগারেটটা টান দিয়ে শেষ করে এ্যাশট্রেতে ফেলে দিয়ে আবার সুরু করেন—"যাই বল, গান্ধীর পলিসিটা নিতান্ত মন্দ নয় আমাদের মতন পরাধীন জাতির পক্ষে। পরাধীন জাত—"

মিঃ গুপ্তের পক্ষে এবার ধৈর্য রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। তিনি আড়মোড়া দিয়ে বলেন—"ওহে হৃষীকেশ! তোমাদের রান্নার আর কত দেরী? এদিকে পেট যে চো চো করছে।"

—পনেরো—

বেসিন বন্দরে সূর্য তখনো পরিষ্কারভাবে ওঠে নি। প্রশস্ত নদীর মোহানার আবেষ্টনে দেখা যায় দুটি অস্পষ্ট নারীমূর্তি। বোমায় বিধ্বস্ত গোডাউন শেডের পাশে এসে থমকে দাঁড়ায় তারা।

একটি মূর্তি বলে—"চল্ বাড়ী ফিরে যাই। ঠিকানা না জেনে এত বড় শহরে কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

দ্বিতীয়া রমণী ভাঙ্গা রেলিংএর উপর ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। গালে হাত দিয়ে কি যেন ভাবে, কোন উত্তর দেয় না।

অবশেষে মুখ ফিরিয়ে চোখ নীচু ক'রে বলে—"তোমার কথাই সত্যি মনে হচ্ছে মীরাদি। তখনি আমার মনে হয়েছিল, এড়িয়ে যাবার জন্য আত্মীয় খাড়া করেছেন! পথে আসতে তো এরকম কথা কোন সময়েই শুনিনি। মিথ্যে বলা কি এতই সোজা? প্রথমে বল্লেন—একজন আত্মীয়ের কাছে যাবো, তারপর বল্লেন, আত্মীয় নয়—আত্মীয়েরও অধিক।"

মীরা পূর্ণদৃষ্টিতে অশোকার মুখের দিকে তাকায়, স্নেহের সুরে বলে "আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি।"

অশোকার মুখ রাঙা হয়ে ওঠে।

দূরে কতকগুলি জাহাজ দেখা যায়। সমুদ্র ও নদীর জল একাকার দ্বীপের মতন গোল হয়ে যেন শহরটা ঘুরে গিয়েছে। ঝপঝপ্ কয়লা ফেলার শব্দ, এরোপ্লেনের আওয়াজ কানে আসে।

কুলির দল ক্রমশঃ পথ চলতে সুরু করেছে। জাহাজে মাল বোঝাই সুরু হবে। স্টীমারের তীক্ষ্ণ বাঁশী বেজে ওঠে।

মীরা ও অশোকা বাড়ী ফিরবার জন্য পা বাড়ায়। যেখানে তারা দাঁড়িয়েছিল তার মাত্র কয়েক গজ দূরেই ভাঙ্গা দেওয়ালের পাশ ঘেঁষে

একটি অসহায় পুরুষ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। প্রবল জ্বরে চৈতন্য লুপ্তপ্রায়। শুয়ে আছে কুঁকড়িয়ে। ঠক্ ঠক্ করে কেঁপে উঠছে বার বার। তৃষ্ণায় গলা বুঝি ফেটে যায়। কে দেবে একফোঁটা জল ?

পথে যেতে যেতে অশোকা শেষবারের মতন ফিরে তাকায়। মীরার চোখের কোণায় দুষ্টু হাসির ঝিলিক খেলে যায়। যেন স্বগতোক্তি করছে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলার ভঙ্গীতে বলে—"হায় আশা !"

"কি বলছো বিড়বিড় করে ?"—অশোকা অপ্রতিভভাবে তৎক্ষণাৎ মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

একটা চিল উড়ে আসে ওপার থেকে, ক্রমশঃ আরও উঁচুতে উঠে মিলিয়ে যায় পশ্চিমদিকে।

—ষোল—

বোমায় বিধ্বস্ত গুদোম ঘরের স্যাঁত সেঁতে মেজের উপর শুয়ে ধুঁকছিল অলোক।

বৃষ্টির ছাট থেকে বাঁচবার চেষ্টা বৃথা। দুর্বল শরীরে নড়ে বসবার শক্তিও যেন ফুরিয়ে এসেছে তার! মাঝে মাঝে নীল নীল পিত্তি বমি করে সে।

ভাঙ্গা টিন, ব্যারেল, বালি ও রাবিশের স্তূপ। দেওয়ালটা কখন ভেঙ্গে পড়ে ঘাড়ের উপর কে জানে? গায়ের কোটটা মাথার নীচে বালিশের মতন ব্যবহার করে আরাম পেতে চায়; কিন্তু শীতের কাঁপুনির জন্য পুনরায় গায়ে দিতে হয়। ক্লান্তভাবে লুটিয়ে পড়ে ইটের স্তূপের উপর মাথা রেখে। আর নড়বার চড়বার ক্ষমতা নেই তার।

সারাদিনের মধ্যে পেটে কিছুই পড়ে নি। আশ্রয়ের জন্য বহু চেষ্টা করেছিল সে। বিরূপাক্ষবাবুর ঠিকানা কেউই বলতে পারল না। ব্যর্থ হয়ে অবশেষে অনুভব করে জ্বর এসে গিয়েছে তার। দেখতে দেখতে জ্বরের বেগ বাড়তে থাকে। কোন রকমে টলতে টলতে বর্তমান আশ্রয়টির সন্ধান মেলে।

একশো পাঁচ ডিগ্রির উপর জ্বর, না আছে চিকিৎসা, না আছে পরিচর্যা। মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে—সর্বশরীরে অসহ্য জ্বালা। বাতাসের মধ্যে যেন অদ্ভুত চাপা গোঙানি, মাথা বুঝি এখনি ফেটে পড়ে!

বমি করতে করতে গলা চিরে যায়, পেট যেন কেবলি মোচড় দিচ্ছে। উঃ মা! বাবা! পিপাসা!—নিদারুণ পিপাসা!...

নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট—শরীরটা ক্রমশঃ কুঁকড়িয়ে আসছে না ?...উঃ, ভগবান ! মৃত্যু দাও—আর পারি না ।...

মেঘ বুঝি কেটে যাচ্ছে—সূর্য উঠেছে কি ?

নতুন আলোর ধারা আসবে। বাতাস বইবে। পুনরায়...স্মৃতির ভিড়...বাচবার সাধ...অসুখ, ভাবনা কি ? আবার সেরে উঠবে ! ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া ! মা বাবা—দুজনেই মারা গিয়েছেন এই অসুখে—ভয়ে অলোকের মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়।

বেহালা বাজায় কে ? বাবা ?...না, না...বাঁশীর সুর ভেসে আসছে কানে। জংলী বর্মীটা মরে গিয়েছে নিশ্চয় এতদিনে। মৃত্যুকে ভয় করে না এমন লোকও আছে !...

সাইরেণ বেজে ওঠে হঠাৎ। .

জঙ্গী প্লেন চক্র দিয়ে ওড়ে আকাশে। কান ফাটানো বোমার গর্জন শোনা যায়। সারা শহর কেঁপে ওঠে। জাপানী বোমারু ঘুরে ফিরে বোমা ফেলে চলেছে। আবার, আবার—দাও—দাও—ধ্বংস করে দাও।

অলোক আর সহ্য করতে পারে না যন্ত্রণা।

উত্তেজনায় উঠে বসে দেখে ভাঙ্গা দেওয়ালটা পড়পড়। বেঁচে থাকার প্রেরণায় দুর্বল শরীরেও সাময়িক ভাবে শক্তি ফিরে আসে। বুকের উপর হেঁটে হেঁটে সরে যায় খানিকটা। হাঁফাতে থাকে। আহত পশুর ন্যায় চারিদিকে কি যেন খোঁজে।...

ভয়ঙ্করী কালী করালবদনী—খলখল আরও হাসো ! মৃত্যু ! নেমে এস, বিলম্বে কাজ কি ?...

দুটো মাতাল গোরা সৈন্য অলোককে দেখতে পায় পথে যেতে যেতে। মদের ঝোঁকে তারা মনে করে নেয়—জাপানী স্পাই। হিড়হিড় করে বাইরে টেনে আনে। লাথি মারতে থাকে বুট দিয়ে দমাদম। অলোকের নাক দিয়ে তাজা রক্ত বের হয়।...

হাসছে কে ?...ভৌতিক হাসি। হাসছে, থেমে যাচ্ছে, আবার হাসছে হিঃ, হিঃ, হিঃ। বিস্মিত মাতাল দুইটি ক্ষণেকের জন্য থমকে দাঁড়ায়। বুঝতে চেষ্টা করে কোথা থেকে হাসি আসছে। কে হাসছে ? কৈ, কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না। মাতাল দুটোর হাত থেকে অলোক আশ্চর্যভাবে রেহাই পায়।

বানরের মতন কদাকার একটি লোক, হাড় জির জিরে, কঙ্কালসার, পাগল। মাথায় লম্বা লম্বা চুল। ভাঙ্গা বারান্দার ছাদের উপর ছেঁড়া কোট গায় দিয়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে অদ্ভুত শব্দ করে হেসে উঠ্‌ছে। পাগলা আগে ছিল মাদ্রাজী স্কুল মাষ্টার—জাতিতে ক্রিশ্চান। বোমার আঘাতে স্ত্রী পুত্র সবাইকে হারিয়ে এখন বদ্ধ পাগল।

"স্ট্যাণ্ড্‌ অন্‌ দি বার্ণিং ডেক্‌ হোয়েন্‌ আল্‌ বাট্‌ হি হ্যাড্‌ ফ্লেড্‌।" পাগলা বুক ফুলিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

সৈন্যরা অলোককে ছেড়ে পাগলার দিকে অগ্রসর হয়।

তখনো পাগলা চীৎকার করে চলেছে—"হু এ্যাম্‌ আই ? হাঃ হাঃ—হাঃ! আই এ্যাম্‌ হিজ্‌ হাইনেস্‌ দি আগা খাঁ অব বার্মা এণ্ড সীলোন...হাঃ! হাঃ!! হাঃ!!! হি! হি!! হি!!!"

প্রথম গোরাটা বারান্দার নীচে এসে দাঁড়িয়েছে যেই পাগলা আমেন বলে একটা থান ইট ছুড়ে মারে। সঙ্গে সঙ্গে গোরা কাৎ। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে। দ্বিতীয়টি সাহায্য করবার জন্য কাছে আসতে পাগলা তাক করে লাফিয়ে পড়ে গোরাটার পিঠের উপর। সঙ্গে সঙ্গে সেটিও ধরাশায়ী হয়। বমি করতে থাকে। পাগলার আনন্দ দেখে কে ? নৃতের ভঙ্গীতে সুর করে গান ধরে—

"টুইনক্‌ল, টুইনক্‌ল লিট্‌ল্‌ স্টার্‌!
হাউ আই কিক্‌ ইউ অফ্‌ দি বার!"

এমন সময় একজন ভারতীয় লেফটেনাণ্টের অধীনে একদল জাঠ সৈন্য পথ বেয়ে আসে। পাগলাটা তাদের কাছে গিয়ে মুখভঙ্গী করে হাসতে থাকে—"হিঃ, হি, হিঃ!"

ধেই ধেই করে নাচেও কয়েক সেকেণ্ড। তারপর এক দৌড়ে ছুটে যায় ভাঙ্গা ইটপাটকেলের মধ্য দিয়ে।

লেফটেনাণ্ট চক্রবর্তীর আদেশে গোরা সৈন্যদুটিকে মিলিটারী হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অলোককে পাঠিয়ে দেন সিভিল হাসপাতালে—নিকটের থানা অফিসরের মারফত। ভাগ্যক্রমে চক্রবর্তী অলোককে চিনতে পেরেছিলেন। আর, আই, এস, সির কাজে অলোকের স্টেশনে মাল ডেলিভারী নিতে যেতে হয় চক্রবর্তীকে। বছর খানিক আগেকার ঘটনা। বাঙ্গালী ও একবয়েসী বলে চক্রবর্তী অলোককে দেখেই চিনতে পেরেছিলেন। কিন্তু অলোকের তখন কোন জ্ঞানই ছিল না।

গণ্ডগোলে আকৃষ্ট হয়ে রাস্তার ঝাড়ুদার চিংশান এসে উঁকি মারে। ভাঙ্গা শেডটার মধ্যে কি যেন শাদা শাদা দেখা যাচ্ছে! সন্তর্পণে ঝাড়ু হাতে এগিয়ে যায় চিংশান। খাপে ভরা পুরনো বেহালাটা—চিংশানের কাছে বিশেষ মূল্যবান নয়। পোঁটলাটির মধ্যে কি আছে? এ যে নোট!...অনেকগুলো নোট!...পিছন ফিরে দেখে নেয় চিংশান আর কেউ তার দিকে নজর দিয়ে রয়েছে কিনা। ঝাড়ুদারটার বরাত ভাল।

—সতেরো—

প্রায় একমাস হাসপাতালে অলোককে থাকতে হয়। ডাক্তার আমেদের চিকিৎসার গুণেই হোক অথবা নার্স মার্গারেটের পরিচর্যার জন্যই হউক অলোক কঠিন ফাঁড়া কাটিয়ে সেরে ওঠে। বেহালাটাও খোয়া গিয়েছে, টাকাগুলোও কেউ নিশ্চয় কুড়িয়ে নিয়েছে, ভাবে অলোক...।

বাংলামুখো যাত্রীদলে যোগ দেয়। হেঁটে চলে চট্টগ্রাম। তারপর কয়েকজন ভদ্রলোকের সাহায্যে টিকিট কিনে কলকাতায় এসে পৌঁছায়। বর্মা ইভাকুয়িস রিলিফ ফাণ্ড থেকে সাহায্যের জন্য ঘোরাঘুরি করে। কিছু কিছু সাহায্য পায়, কিন্তু তাতে আর কদিন চলে? চাকরির জন্য নাম রেজিষ্ট্রি করেছে, এই ডাক আসে আসে আসে না। তারপর ঘটে যায় অনেক কিছু ঘটনা।...

* * *

"আরে অলু যে? তারপর? এখনো তাহলে বেঁচে আছো? উঃ, তোমাকে কি খোঁজাই না খুঁজেছি। কাগজে বিজ্ঞাপন দেব কিনা ভাবছিলাম তোমার মাসীমার তাগাদায়।"

অলোককে প্রায় জড়িয়ে ধরেন প্রৌঢ় নিঃসন্তান বিরূপাক্ষ সেন। বিরূপাক্ষবাবুর একটা ছোটখাটো কাঠের গোলা ছিল রেঙ্গুণে। পরে তিনি সেটা উঠিয়ে নিয়ে যান বেসিনে। অলোকের বাবার সঙ্গে বিরূপাক্ষবাবুর পরিচয় ছিল অনেকদিনের। অংশুপ্রকাশবাবু ও উজ্জ্বলা দেবী অর্থাৎ অলোকের বাবা ও মা—দুজনেই ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ায় মারা যান। তারপর অলোক বিরূপাক্ষবাবুর কাছেই মানুষ।

বি, এস, সি, পড়তে পড়তে রেলের একটা কাজ পায় সাময়িক ভাবে। পড়াশুনা ছেড়ে চাকরীতে ঢোকে। তারপর টেলিগ্রাফি শিখে পাকাপোক্ত রেলওয়ে কর্মচারী হতে বেশী বেগ পেতে হয় নি। চাকরী পাওয়ার পর বিরূপাক্ষবাবুর সঙ্গে বিশেষ দেখাশুনো হোত না, তবে পত্রযোগে অন্নপূর্ণা দেবী প্রায়ই খোঁজ নিতেন, এবং বাধ্য হয়ে অলোককে পত্রের উত্তর দিতে হোত। রেঙ্গুণে থাকতে মাঝে মাঝে দেখা করে গিয়েছে; কিন্তু বেসিনে কারবার স্থানান্তরিত হবার পর থেকে এঁদের সঙ্গে অলোকের সংযোগ ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। তবুও অন্নপূর্ণা চিঠি লিখতেন মাঝে মাঝে, বেসিনে আসলেই যেন ওদের ওখানে ওঠে, অনেকদিন অলোকের মুখখানা দেখতে না পেয়ে মন কেমন করে, পরের ছেলের উপর কেউ যেন মায়া না করে কোনদিন, অলোক কি বৎসরেও এক সপ্তাহেরও ছুটি নিয়ে আসতে পারে না, ইচ্ছে থাকলে সবই হয় ইত্যাদি।...

অলোক বিরূপাক্ষবাবুর পায়ের ধূলো নিয়ে জিগ্যেস করে স্মিতমুখে, "মাসীমা কোথায় ?"

"নিমতলা ঘাটে।"

অলোক চমকে ওঠে—"এ্যাঃ! মাসীমা নেই!"

"আরে না না, তুমি দেখছি এখনো সেই রকম হাঁদারাম আছো। সব কথা সোজা বুঝে নেওয়াও বোকামী, আবার কোন কোন সময় সোজা কথা সোজা ভাবে নেওয়া উচিত।"

অলোক বিস্মিতভাবে বিরূপাক্ষ সেনের দিকে তাকায়।

বিরূপাক্ষবাবু অলোককে হাত ধরে টানতে টানতে একটা ট্রামে চড়ে বসেন।

বিডন ষ্ট্রীটের মোড়ে নেমে হেঁটে যান। নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটের কাছেই তাঁর বাসা এতক্ষণে খুলে বলেন। অলোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

বিরূপাক্ষবাবু বরাবরই হিসেবী লোক। তাছাড়া কোলকাতায় পিতৃপুরুষের তিনতলা বাড়ীর এক অংশও তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। বর্মা ছেড়ে এসেও তাঁকে আর্থিক কষ্টে পড়তে হয় নি। স্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবীরও হাড়কেপ্পন বলে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন মহলে অখ্যাতি ছিল। চোদ্দ বছরের মা-বাপহারা ফুটফুটে ছেলেটিকে যেদিন তাঁর স্বামী কাঠগোলায় এক কোণায় আশ্রয় দেন সেদিন তিনি স্বামীর সঙ্গে ঝগড়াই করেছিলেন।

"কোথা থেকে যার তার ছেলে নিয়ে এলে? তোমার যেমন! পয়সায় কামড়াচ্ছে—না? জাত ধর্মো কিছুই খোঁজ নিলে না অমনি হুট্ করে নিয়ে এলেই হোল! আমি কিন্তু—রান্নাঘরে ওকে ঢুকতে দেব না কিছুতেই বলে দিচ্ছি।"

"কি যে বল গিন্নি! ও ছেলেটি বড় বংশের—কুলীন কায়স্থ—তোমার জাত যাবার ভয় নেই। অংশুবাবুর কথা মনে নেই? নেলসন হাওয়ার্থ কোম্পানীতে কাজ কর্তেন ভদ্রলোক। গত বছর তোমাকে নিয়ে গেলাম। ঐ যে নদীর ধারে সাহেবদের কাঠগোলাটা, তার পিছনে একতলা শাদা বাড়ী—মনে পড়েছে?"

অন্নপূর্ণা দেবী চুপ করে যান, কি যেন ভাবেন, তারপর বলেন, "আহা, বৌটার কি সুন্দর চেহারা ছিল! কি হয়ে ম'রল? দুজনে নাকি একঘণ্টা আগে পেছু মরেছে? রমেশ আচাজ্জির ঠাকুমা বলছিল।"

"হাঁ অলোকের মা আগেই মারা যান, ঠিক একঘণ্টা আগে।"

"তা যাই বল, বৌটার হাবভাবে যেন কেমন ক্রিশ্চানি ভাব ছিল, একটা ঘরেও কি ঠাকুর দেবতার ছবি রাখতে নেই? আমার যা হচ্ছিল তখন—ভাগ্যিস কিছু খেতে টেতে দেয় নি।"

......রাত্রিতে খাওয়া দাওয়া সেরে অন্নপূর্ণাদেবী স্বামীর পাশে বসেন। পুনরায় বকতে সুরু করেন—"আচ্ছা তোমার আক্কেলটা কি বল তো?"

বিরূপাক্ষবাবু চমকে উঠে বলেন—"কেন কি হয়েছে ?"

"ছেলেটাকে যে বাড়ী আনলে—কত আর বয়েস—দুধের ছেলে বললেই হয়। তোমার নয় ছেলেপিলে হয় নি, তাই বলে অপরের ছেলেকে এনে কষ্ট দেওয়া কেন ? খালি খাটে—বিছানা নেই, বালিশ নেই, শুধু হাতের ওপর মাথা রেখে কি কেউ ঘুমুতে পারে ? সেই যে বেরিয়ে গেলে আর একবারও খোঁজ নেওয়া নেই ! ছেলেটা কি খেল, কি পরল...!"

বিরূপাক্ষবাবু উঠে পড়েন বিছানা ছেড়ে, নিজের বালিশটা তুলে নেন কোলের উপর।

"আমার বালিশটা দিয়ে দিলে কি হয় ? এটা ছিঁড়েও গিয়েছে। আমাকে একটা নতুন কিনতেই হবে। ছেঁড়া সতরঞ্চিও বুঝি আছে ওঘরে। ওটাও না হয় দিও, কিছুদিনের জন্য। কাঠগোলার কিছু কিছু কাজ শিখুক, দুচার পয়সা আয় করতে পারবে নিশ্চয়, তখন নতুন সতরঞ্চি না হয় একটা কিনে নেবে।"

অন্নপূর্ণাদেবী গালে হাত দিয়ে বলেন, "ওমা ! তুমি অবাক করলে দেখছি ! বলি তোমার টাকাগুলো খাবে কে ? ভদ্রলোকের ছেলে —আহা বেচারীর মাও নেই, বাপ নেই—রাজপুত্রের মতন চেহারা— অমন ছেলেটাকে কিনা তুমি ছুতোরের কাজ শেখাবে ! ঝ্যাটা মারো তোমার ব্যবসাকে। তোমার টাকা নিয়ে তুমি যখ হয়ে বসে থাকো—আমি বাপু কাল থেকে কিছুর মধ্যে নেই।"

...অবশেষে অনেক শলা পরামর্শের পর ঠিক হয় কাল থেকে সব ব্যবস্থাই করা হবে।

কখন যে অলোক অতৃপ্ত মাতৃত্বের আকাঙ্খাকে জাগিয়ে নিজের আসন কায়েমী করে নিয়েছিল সে নিজেও জানতে পারে নি। অন্নপূর্ণা দেবীও নিজের কাছে স্বীকার করতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু ফুটফুটে ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে অন্নপূর্ণা দেবী গোপনে

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতেন। ঐ ছেলেটিকে কেন ভগবান তার গর্ভে পাঠালেন না ?

বিরূপাক্ষবাবু অলোককে নিয়ে একটা পুরানো বাড়ীর সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে থাকেন। তিনতলার বারান্দায় কতগুলো টবে গাছ, টবগুলোর ফাঁক দিয়ে সরু পথ। রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক ছাড়েন, চেঁচিয়ে বলেন—"দেখ এসে বাইরে—কাকে ধরে এনেছি।"

অন্নপূর্ণা দেবী রান্না করছিলেন। কাপড়চোপড়ে হলুদের দাগ। ঘোমটা টেনে বেরিয়ে আসেন। অলোককে দেখতে পেয়ে ঘোমটা খোলেন, তাকিয়ে থাকেন ক্ষণেকের জন্য নির্নিমেষ নয়নে। আঁচল দিয়ে চোখের কোণা মোছেন। কিছু বলতে পারেন না সহজে।

অলোক প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো নিতেই অন্নপূর্ণা দেবী সজাগ হয়ে ওঠেন, বলেন—

"কল্যাণ হোক! এস বাবা, রান্নাঘরের ভেতরে এসে বোসো।...ঐ পিঁড়িটা...আমি ততক্ষণে ডালের সোম্বোরাটা সেরে নি।"...

—আঠারো—

..."কেমন ধারা লোক বটে গো ?"

ভাঙ্গা লাঠি হাতে একজন বুড়ী ভিখিরিণীকে ধনঞ্জয় ধাক্কা দেয় অন্যমনস্কভাবে। দুপুর রোদে ভাবতে ভাবতে পথ চলছিল—ভিখিরিণীকে নজর করে নি।

খেয়াল হয় বুড়ীর ভৎসর্নায়। লজ্জিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে দেখে ভিক্ষের পয়সা কয়টি বুড়ীর হাত থেকে ছিটকে পড়েছে রাস্তায়। পয়সাগুলো কুড়িয়ে হাতে তুলে দেয়। নিজের পকেট হাতড়ে আরও চার আনার পয়সা যোগ দেয়। দুঃখ প্রকাশ ক'রে পুনরায় হাঁটতে সুরু করে।

পথে কণ্ট্রোলের দোকানে সারি সারি লোকের ভিড়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের সারা গা দিয়ে ঘাম ঝরছে, তবুও দাঁড়িয়ে আছে তারা। কেউ অভিসম্পাত দিচ্ছে। শুধু দুমুঠো অন্নের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করতে হবে, ঠেলাঠেলি—চীৎকার। যাদের পয়সা নেই, সম্বল নেই, তারা গিয়েছে লঙ্গরখানার লাপসি খেতে। কোথাও বা একদল শীর্ণকায় ছেলেমেয়ের দল করুণ সুরে গৃহস্থের দরজায় বসে বিনিয়ে বিনিয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছে—একটু ফেন দাও না মা।

ধনঞ্জয়ের হঠাৎ যেন বোধ হয় সংখ্যাহীন নরনারীর হা হুতাশ তার কানে এসে আঘাত করছে—হাজার হাজার, লাখ, লাখ লোকের মৃত্যুর ছায়া—আকাশে দীপ্তি কৈ ? প্রাণে উৎসব কৈ ? স্বাভাবিক জীবনযাত্রা কি আর কোন দিন ফিরে আসবে ?...

ততক্ষণে ধনঞ্জয় নির্মল ডাক্তারের লেবরেটারী বাড়ীর দরজায়

পৌঁছে যায়। পিছন থেকে মোটরের হর্ণ বাজে। ফিরে দেখে স্বয়ং নির্মল ডাক্তার গাড়ী থেকে নামছেন।

"ওহে ধনঞ্জয়! এই সবে শিয়ালদা ষ্টেশন থেকে আসছি। তারপর? মা এসে গেছেন তো?...আসেন নি?...আচ্ছা, ধরো, ব্যাগটা।"

ধনঞ্জয়কে কোন কথা না বলতে দিয়েই নির্মল তার কাঁধের উপর হাত রাখে, ধনঞ্জয় নির্মলের সঙ্গে অন্দর মহলের দিকে অগ্রসর হতে বাধ্য হয়।

—উনিশ—

ভবানীপুরের কোন এক তিনতলা বাড়ীর সুসজ্জিত কক্ষে বিছানার উপর শুয়ে আছে একটি যুবতী। তার চোখের কোণায় জল। এখনো শুকোয় নি। সমবয়স্কা যুবতী আর একটি বিছানার এক পাশে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। তার দৃষ্টি জানালা দিয়ে শহরের যতটুকু দেখা যায় সেই দিকে, না অন্যমনস্কভাবে আপন চিন্তায় ডুবে আছে মন—বুঝে নেওয়া কঠিন।

দুইজনেই প্রায় সমান বয়সের ও সমান সুন্দরী।

ঘরের মাঝখানটায় শ্বেত-পাথরের টেবিল। তার উপর একটা বেহালা শোয়ানো; ছড়টার তার খানিকটা ছিঁড়ে গেছে, খাপটার খানিকটা অংশে আলকাতরার দাগ।...

অন্যান্য আসবাবপত্র যথেষ্টই আছে—তিনটি বই ভর্তি সুদৃশ্য আলমারী, একটি গ্লাসকেসে তাজমহলের ক্ষুদ্র সংস্করণ, ডলি পুতুল, মাটির খেলনা, শ্বেত পাথরের বুদ্ধমূর্তি।

দ্বিতীয়া যুবতীর কথায় বোঝা যায়, সে-ই বয়সে সামান্য বড়।...

"কি করবি ভাই? অদৃষ্টের উপর তো আর কারুর হাত নেই। যে বেঁচে নেই তার জন্যে মিছিমিছি মন খারাপ করে লাভ কি বল? সারাজীবন ধরে তো শুধু স্মৃতি নিয়ে থাকা চলবে না। তাছাড়া এ যা সম্বন্ধ এসেছে এরকম সম্বন্ধ খুব কমই পাওয়া যায়। ধনে, মানে, বিদ্যায়, গুণে, রূপে—সব দিক থেকেই নির্মলবাবুর মতন ছেলে পাওয়া যাবে না। জানিস মস্তবড় জমিদারীর একমাত্র উত্তরাধিকারী হয়েও ভদ্রলোক এক পয়সাও নিজের বা নিজের পরিবারের খরচের জন্য নেন না।"

প্রথমা চোখ মুছে উঠে বসে, দ্বিতীয়ার বক্তৃতার স্রোতে বাধা দিয়ে বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করে—

"টাকাগুলো যায় কোথায় ?"

"বাৎসরিক আয়ের সবটাই খরচা বাদে তিনি কৃষকদের ও গ্রামের কল্যাণে ব্যয় করেন। ওদের জমিদারীর প্রজা—একজন ভদ্রলোকের কাছেই জ্যোঠামশায় শুনে এসেছেন। নে ওঠ, শীগ্গির তৈরী হয়ে নে। ওরা আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই এসে পড়বেন।"

প্রথমা এইবার হাসবার চেষ্টা করে—কতকটা অসংলগ্নভাবে প্রশ্ন করে—

"যদি তোমাদের ভদ্রলোক সব টাকাই বিলিয়ে দেন, তা হলে বিয়ে করবার সখ কেন আবার ? বিয়ের পর পেট চলবে কি করে ?"

"কি যে বলিস বোকার মতন ! ডাক্তার, বিলেত ফেরত ডাক্তার—তাঁর আবার রোজগারের ভাবনা ?"

"তবে এই যে সকাল বেলায় বলছিলে তিনি নাকি চিকিৎসা করেন, কিন্তু ফি নেন না—বাড়ীতে দাতব্য চিকিৎসালয়। কত কথা বল্লে—এর মধ্যে ভুলে গেলে !"

"ও মেয়ে—তোমার মনে এতখানি ! সব কথা মনে করে রেখেছ, আর বাইরে ভাব দেখাচ্ছ যে এ বিয়েতে তোমার মোটেই কোন ইচ্ছে নেই।...তা...তা...তুই বলবি ওসব চলবে না, বেঁচে থাকতে হলে টাকা রোজগার কর্তে হবে।"

"এ আবার কি কথা ? বললে...বাড়ী ভাড়া থেকে মাসিক আয় তিন হাজারের উপর। রোজগার করতে যাবেন কোন দুঃখে ?"

"ব্যাটাছেলে যতই ধনী হোক—না খাটলে মেয়েমানুষেরও অধম। ভুঁড়িওয়ালা, গোলগাল বড়লোকের ছেলেগুলোকে আমি দুচোখে দেখতে পারি না।"

"এঁরও কি ভুঁড়ি আছে ?"

"না না, ভুঁড়ি থাকবে কেন। বেশ সুন্দর চেহারা—এলেই দেখতে পাবি। শুধু শুনেছি দোষের মধ্যে চোখে চশমা—পুরু লেন্‌সের। পাওয়ারটা বোধ হয় একটু বেশী। তা হোক, প্রায় প্রতিভাবান লোকেরই চোখে চশমা থাকে।"

"তাহলে তুমিই ওর গলায় মালা দাও—তোমারও প্রতিভা বাড়বে—আমিও অব্যাহতি পাব।" "ভারী ফাজিল হয়েছিস—না !"

* * *

...সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসে ধীরে। অশোকা উঠে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়ায়। সন্ধ্যাতারা ফুটে ওঠে আকাশে। রাস্তায় উড়ে কুলি মই কাঁধে ছুটে চলেছে। গ্যাস পোস্টের পর গ্যাস পোস্ট—মই লাগিয়ে উঠবে—আলো জ্বালিয়ে চলবে অভ্যস্ত কৌশলে। ট্রামগাড়ির ঘড়ঘড়ানি শোনা যায়। বাসের শব্দ—নিকটে বাজারের কোলাহল ভেসে আসে।

হাজার হাজার পথচারীর পদধ্বনি। একটা ছেলে কি কাঁদছে ? অবগুণ্ঠিতা গৃহস্থবধূ নিকটে কোথায় শঙ্খ বাজালো ? মুহূর্তের জন্য অশোকা সঙ্কল্প হারিয়ে ফেলে। কঠিন সমস্যা।......

সত্যিই কি এতদিন পর বেহালাটি মৃত্যুর নিঃসংশয় স্বাক্ষর বহন করে এসেছে তার কাছে ?

আশ্চর্য ঘটনাও বটে !

কাল বিকেলে অমলপ্রকাশ ও মীরার সঙ্গে অশোকা মিউনিসিপাল মার্কেটে গিয়েছিল কয়েকটি জিনিষপত্র কেনাকাটি করতে। ফেরতা পথে অমলের পূর্বপরিচিত বিরুপাক্ষবাবুর সঙ্গে তাদের দেখা হয়। বিরূপাক্ষবাবু বর্মা ছেড়ে কলকাতা এসে মিউনিসিপাল মার্কেটের কাছাকাছি একটি এংলোইণ্ডিয়ানের কাছ থেকে "মিউজিক মার্ট" নামে দোকানটা কিনে নেন। মিউজিক মার্ট তাঁর হাতে এসে ক্রমশঃ দাঁড়িয়ে যায় ভ্যারাইটি ষ্টোরসে, কিউরিও প্যাটার্ণের জিনিষের প্রতি যাদের

ঝোঁক বেশী তাদের পটাপট পটিয়ে ফেলেন বিরূপাক্ষবাবু। তাঁর কথা বলবার ভঙ্গীতেও অনেক কাজ হয়, অল্প কিছু দিনের মধ্যেই দোকানটা দাঁড়িয়ে গিয়েছে বেশ।

বিরূপাক্ষবাবুর পীড়াপীড়িতে অশোকারা দোকান দেখে যেতে বাধ্য হয়। দোকানের মধ্যে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করবার পর হঠাৎ অশোকার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় একটি জিনিষের প্রতি। অদ্ভুত ধরণের বেহালা—এও কি সম্ভব—কানের উপর ছুরির দাগটা পর্যন্ত এক, তাছাড়া পিতলের প্লেটে পদ্ম—খাপটার উপর সেইরকম সাপের ছবি আঁকা—এক পাশে আলকাতরার দাগটা পর্যন্ত ঠিক একই। তবে কি—?

অলোকের বেহালা পথে আসবার সময় অশোকা অনেকবার নাড়া চাড়া করে দেখেছে। তাই আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখে বেহালাটার দাম জানতে চায়। বিরূপাক্ষবাবু ঝোঁক বুঝে কোপ মারেন। দু'শো টাকার কমে বিক্রী করলে নাকি তাঁর একপয়সাও মুনাফা থাকবে না!

"এই ব্যায়লাটার একটা ইতিহাস আছে—জানেন অমলবাবু?"

অমলবাবু ওরফে অমলপ্রকাশের বেহালা ব্যাপারে কোন ঔৎসুক্য ছিল না কোনদিন। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে জিগ্যেস করে—"কি ইতিহাস?"

"এটা একশো বছরের উপর পুরনো। এটা ছিল সুন্দরী রাজনর্তকী মাওরিণার প্রেমিক বর্মার শ্রেষ্ঠ বেহালাবাদক ও গায়ক থাকিন পোর বেহালা। দু'শো বছরের উপর পুরনো সেগুণ কাঠ দিয়ে তৈরী খাপটা, একবার হাত দিয়ে দেখুন কত ভারী।"

"কি করে জানলেন এটা থাকিন পোর বেহালা? পেলেন কোথা থেকে?"

"এই দেখুন বর্মী অক্ষরে লেখা—নাম খোদাই।"

বিরূপাক্ষবাবু এগিয়ে এসে খাপটা চিৎ করে ধরেন—সবাইকে দেখান খোদাই করা হিজি বিজি অক্ষর কতকগুলো। বর্মী ভাষায় লেখা—অমলপ্রকাশ স্বীকার করে। কি যে লেখা আছে তা পড়া সম্ভব নয় বলে বাদানুবাদ করে না। অ্যাশোকারও মনে পড়ে, হ্যাঁ, কি যেন হিজিবিজি লেখা ছিল তলাটায়—তখন ওর কিছু মানে থাকতে পারে তা সে ভেবে দেখে নি। একে খাপটা বহু পুরনো, তেলে ও হাতের স্পর্শে কালো, তারপর কোথায় যেন আলকাতরার স্পর্শ পেয়ে জায়গায় জায়গায় আবলুস কাঠের চেয়েও কালো হয়ে আছে—তখন অত খেয়াল হয় নি।...

বিমূঢ় বিস্ময়ে অশোকা শুনতে পায় বিরূপাক্ষবাবু তখনো ব'কে চলেছেন—

"এটা কিনেছিলাম একটা ঝাড়ুদারের কাছ থেকে। কোন এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক বোমার টুকরো লেগে রাস্তায় মারা যান। তাঁর হাতে ছিল বেহালাটি—ছিটকে পড়েছিল হাত থেকে—রাস্তার নর্দমার পাশে।"

অশোকার বুক টিপ্‌টিপ্ করছিল অনেকক্ষণ ধরে। অলোকের বেহালা যে সন্দেহ নেই। অনেকবার নাড়াচাড়া করেছে যে যন্ত্রটিকে, দীর্ঘ পথের সঙ্গিনী হয়ে তাকে কি ভুল করা চলে? এই যন্ত্র থেকে সেই রাত্রে নদীর উপর যে সুর ছড়িয়ে পড়েছিল সেই সুরের আধার—না, না—অসম্ভব—এই সেই বেহালা—অলোকবাবুর...

কিন্তু, কিন্তু...তা যদি সত্যি হয়...তাহলে—? অশোকা নিকটে চেয়ারে অবসন্ন ভাবে বসে পড়ে—সারা শরীর ঝিমঝিম করে আসে। অকস্মাৎ বোমার টুকরো কি লাগলো তার বুকে?...

মীরা উদ্বিগ্নভাবে চেয়ে দেখে অশোকার মুখে রক্তের লেশমাত্র নেই। মীরা তৎক্ষণাৎ আন্দাজ করে নেয় ব্যাপারটা। কিন্তু সে চুপ করে থাকে। কোন কথাই আর জিগ্যেস করতে সাহসী হয় না। কিই বা আর প্রশ্ন আছে? সমস্তই জলের মতন পরিষ্কার।

তারা যেদিন অলোকবাবুর খোঁজ করে ফিরছিল সেদিন কিছুক্ষণ পরেই বেসিনে জাপানীরা বোমা ফেলতে সুরু করে। নিশ্চয় সেইদিন পথ চলতে চলতে অলোকবাবু মারা গিয়েছেন।...

আহা, ভদ্রলোককে কেন তারা ঠেকিয়ে রাখলো না সেদিন?—জ্যেঠামশায় যদি টাকা দিয়ে অপমান না করতেন ভদ্রলোক নিশ্চয় থেকে যেতেন—শেষ পর্যন্ত বকশিস্ দেওয়াটাই হোল কাল।...

অশোকা ততক্ষণে সামলে নিয়েছে নিজেকে। অমলপ্রকাশের সঙ্গে বিরূপাক্ষবাবু একটু দূরে কথা বলছিলেন, অশোকার ভাবান্তরে একটু বিস্মিত হন। কিন্তু মুখ ফুটে বিস্ময় প্রকাশ করেন না।

অশোকা নিজেই উঠে এসে বিরূপাক্ষবাবুকে সম্বোধন করে বলে—"এই বেহালাটি আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন—যা দাম হয় বিল করে পাঠাবেন।" ব্লাউস থেকে ফাউণ্টেনপেন খুলে নিয়ে একটা শ্লিপে লিখে দেয় ঠিকানা।...

...দুশো টাকাই দাম ঠিক রইল। বলে কি মেয়েটি! কোন দর করল না? বিরূপাক্ষবাবু নির্বাক ভাবে অশোকার মুখের দিকে আর এক নজর তাকিয়ে দেখেন—তারপর অপ্রতিভের মতন হাত কচলিয়ে বলেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমি এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি—শুনছেন ভোলানাথবাবু, এদিকে আসুন তো—"

—কুড়ি—

সেদিন রাত্রিবেলায় অলোকের নিমন্ত্রণ ছিল বিরূপাক্ষবাবুর বাড়ীতে। অন্নপূর্ণা দেবী সকাল থেকে যোগাড়-যন্তর করে রান্না করেছেন। অনেকদিনের ইচ্ছে অলোককে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়ান।

বিরূপাক্ষবাবু খেতে খেতে বলেন—"দেখ অলোক, কাল থেকে আর তোমার মেসে খাবার দরকার নেই। তোমার মাসীমা বলছিলেন তিনি তোমার ক্ষিধেটা মিটিয়ে দেবার ভার নেবেন। বিনিময়ে শুধু তুমি মাসীমার বাড়ীটা আমার অবর্তমানে পাহারা দেবে। ইচ্ছে যদি করো শুদ্ধ বস্ত্রে মাঝে মাঝে এক ঘটি গঙ্গাজল এনে দিও। আজকাল ভারীরা নাকি হরদম কলের জল গঙ্গাজল বলে চালিয়ে দিচ্ছে।"

অলোক মিটিমিটি হাসে—"এত কাছে গঙ্গা থাকতে মাঝে মাঝে কেন, সকাল সন্ধ্যেই এনে দিতে পারি। কিন্তু কথা হচ্ছে—ছত্রিশ জাতির রান্না খেয়ে মানুষ আমি। আমার ছোঁওয়া গঙ্গাজল দিয়ে কি কাজ হবে ?"

মাসীমা তিরস্কারের ভঙ্গীতে বলেন—"ওকি কথা বাছা! মা গঙ্গা ত্রিভুবনতারিণী, তাঁর জল কোন সময়েই অশুদ্ধ হয় না। একথা এতদিনেও জানো না। জানবে কি করে—জীবনটা কাটিয়ে এলে বর্মায়। ওটা সরিয়ে রাখলে কেন ? ওটা ঝাল চচ্চড়ি।"

ঝাল খেয়ে অলোকের অবস্থা তখন কাহিল, মাসীমার দিকে মুখ তুলে চাইতে ভরসা নেই।

বিরূপাক্ষবাবু হাসতে হাসতে বলেন—"তুমি যদি জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার আশা রাখো তাহলে আরো ঝাল খাওয়ার অভ্যাস করো। মাসীমার হেপাজতে থাকলে এ অভ্যাসও ফিরে পাবে।"

খাওয়া দাওয়া সারা হবার পর মেজের উপর শীতল পাটি বিছিয়ে পান চিবুতে চিবুতে বিরূপাক্ষবাবু শুয়ে পড়েন।

"ওরে হরে! গড়াগড়াটার জলটা একটু বদলে আন।"

হরে ওরফে হরিশঙ্কর অর্থাৎ বাড়ীর উড়ে চাকর। তার খাওয়া শেষ হয় নি তখনো। অলোক গড়াগড়াটা তুলে নিয়ে বাইরে থেকে জল বদলিয়ে আনে। কলকেটায় ফুঁ দিয়ে ঠিকঠাক বসিয়ে নলটা এগিয়ে দেয় বিরূপাক্ষবাবুর হাতে। নিকটে আসন টেনে বসে।

বিরূপাক্ষবাবুর মুখ ও নাক দিয়ে ধোঁয়া বের হতে থাকে। ফুড়ুক ফুড়ুক টান দেন। বালিশের উপর চোখ বুজে থাকেন, হঠাৎ কি ভেবে বলেন—

"জানো হে, অলোক, আজকে একটা মজার ব্যাপার হয়েছে। বেসিনে থাকতে একটা ঝাড়ুদার একবার দশ টাকায় একটা বেহালা বেচে যায় আমার কাছে। পথে কুড়িয়ে পেয়েছে বল্ল। সেই বেহালাটা আজ দু'শো টাকায় বেচেছি—একটি মেয়ের কাছে। আশ্চর্য! আমি এখনো বুঝতে পারছি না মেয়েটার মুখ ওরকম ফ্যাকাশে হয়ে গেল কেন।"

কিছুক্ষণ আবার গড়গড়ার শব্দ শোনা যায়, পুনরায় বলতে থাকেন বিরূপাক্ষবাবু—

"বেহালাটার খাপের নীচে বর্মী অক্ষরে খোদাই ছিল থাকিন পো আর মাওরিণার নাম। আমি তাদের বানিয়ে দিলাম শ্রেষ্ঠ গায়ক ও রাজনর্তকী। একশো বছরের উপর পুরনো বলে হেঁকে বসলাম দাম দু'শো টাকা। দু'শো টাকা দিয়েই কিনে নিলে মেয়েটি। ঐ যে বেসিনে

মণ্টগোমারী রাইসমিলসের হৃষীকেশ দে—তার ছেলে অমলপ্রকাশ—বেশ গোলগাল ফর্সা চেহারা—তুমি দেখেছ তাকে—রেঙ্গুণ থাকতে হৃষীকেশবাবু ওকে সঙ্গে নিয়ে একবার এসেছিলেন আমাদের বাসায়—তা ভুলে যেতে পার—সে অনেকদিনের কথা।

আজ অমলপ্রকাশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল পথে। টেনে নিয়ে গেলাম দোকানে। দুটো মেয়ে ছিল সঙ্গে—বললে বোন। এক বয়েসী, বোধ হয় খুড়তুতো জ্যেঠতুতো বোন হবে। আমি আর অত খুঁটিয়ে জিগ্যেস করি নি। দুটো মেয়েই কিন্তু আশ্চর্য সুন্দরী।"

অলোক চুপ করে শুনছিল। তার মুখের উপর কিসের ছায়া নেমে এসেছে যেন। বাধা দিয়ে বলে—"কি বলছিলেন না বর্মী অক্ষরে নাম লেখা—থাকিন পো আর মাওরিণা? বেহালাটার পেছন দিকটায় কি একটা পেতলের প্লেটে ছোট্ট পদ্মফুল আঁকা আছে?"

বিরূপাক্ষবাবু মুখ থেকে নল ছাড়িয়ে নিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসেন—"তুমিও দেখছি অবাক করলে আমায়। সত্যিই তো, পেছন দিকে পেতলের প্লেটে পদ্ম আঁকা আছে। কি ব্যাপার? তুমি এ খবর কি করে জানলে?"

অলোক হেসে উত্তর দেয়—"যেহেতু বেহালাটি এক সময় আমারি ছিল।"

"বল কি!"

"সে এক কাহিনী, বলতে গেলে আজ আর মেসে ফিরে যাওয়া যাবে না। রাত এগারোটায় মেসের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। অনেক ডাকাডাকি করে চাকর ব্যাটাকে তুলতে হয়—সে বড় হাঙ্গামা। আজ থাক—আর একদিন বেহালার ইতিহাস শোনাব।"

"আর একদিন! মানে? কাল সকালেই মেস ছেড়ে এখানে চলে আসবে! না হলে তোমার মাসীমা ভয়ানক দুঃখিত হবেন।

বলতে গেলে আমরা তো দু'জন প্রাণী। পয়স-কড়ি যদিও আমার

বেশী নেই, তাহলেও তোমাকে দুমুঠো দুবেলা খেতে দিলে আমি গরীব হয়ে যাব না।”

অলোক জিব কেটে বলে—“কি যে বলেন মেসোমশায়! আপনার আর মাসীমার খেয়েই তো মানুষ হলাম। আপনি না থাকলে—”

“কি কথা হচ্ছে এত?” অন্নপূর্ণা দেবীর প্রবেশে অলোকের বাক্যস্রোত হঠাৎ থেমে যায়।

অন্নপূর্ণা দেবী পানের মসলা খোঁজ করতে করতে বলে চলেন—“অলোক বুঝি আপত্তি করছে? ওসব আপত্তি চলবে না। তুমি কালকে নিজে গিয়ে ওকে গাড়িতে করে উঠিয়ে নিয়ে আসবে। মালপত্র আসে আসুক; না আসে পরে আনিয়ে নিলেই চলবে।”

অলোক হেসে উত্তর দেয়—“না মাসীমা—মেসোমশায়কে আর কষ্ট করে যেতে হবে না। তোমার যখন আদেশ তখন আমি নিজেই আসব। মালপত্র বিশেষ কিছুই নেই, একটা ছেঁড়া সতরঞ্চি, একটা ভাঙ্গা ট্রাঙ্ক। ছিল একটা বেহালা এককালে সম্পত্তির মধ্যে—তাও নাকি মেসোমশায় আজ কোন ভদ্রলোকের বোনের কাছে দু'শো টাকায় বেচে দিয়েছেন।”

বিরূপাক্ষবাবু তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বলেন—“অলোক! তুমি সত্যি বলছ? বেহালাটা তোমার? কিন্তু—”

অলোক আর দাঁড়ায় না, বিরূপাক্ষবাবুও অন্নপূর্ণাদেবীর পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায়। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবার সময় তার কথাগুলো অস্পষ্টভাবে দুই একটা কানে আসে অন্নপূর্ণাদেবীর। লাস্ট ট্রাম কখন বন্ধ হয় বা হয় না অসংলগ্নভাবে চিন্তা করেন তিনি।...

—একুশ—

প্রশস্ত ড্রইংরুমে সোফায় হেলান দিয়ে নির্মল ডাক্তার চুরুট টানে। অমলপ্রকাশ একটি গ্রুপ-ফটো নির্মলের হাতে এগিয়ে দেয়। ধনঞ্জয় কুণ্ঠিতভাবে কুশনে বসে আছে—নির্মলের আদেশের অপেক্ষায়।

"আমাকে কি ডেকেছেন?"

"হ্যাঁ, এদিকে এস, আমার পাশে এসে বস। ..অমলবাবু! চুরুট চলবে কি? বর্মায় ছিলেন—চুরুট খান না, সে কি কথা! আচ্ছা, তাহলে সিগারেট আনিয়ে দি—ওরে ভজা ”

ভজহরি ডাক শুনে ঘরে প্রবেশ করে ও আদেশ জেনে বেরিয়ে যায়।

পাইপে তামাক ভরে আগুন ধরিয়ে নির্মল মোটা চশমার আড়ালে একবার ধনঞ্জয়, তারপর অমলপ্রকাশের দিকে এক নজর চেয়ে দেখে।

নির্মল ফটোটা কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে, তারপর ধনঞ্জয়ের হাতে দিয়ে বলে—'দেখতো ধনঞ্জয়—এই নাও ম্যাগ্নিফাইংগ্লাস—ভাল করে দেখে বলো—এই গ্রুপের মধ্যে কার এখনো বিয়ে হয় নি, এবং সব চেয়ে কে বেশী সুন্দরী। ভয় নেই এ নিয়ে ট্রোজান ওয়ার বাধবে না। তুমি নির্ভয়ে বলতে পার। তোমার চোখ ভাল—দেখতো একবার ভাল ক'রে। বেশ বিচার করে রায় দিও। তোমার রায়ের উপর আমার ফাইন্যাল ডিসিসন—মনে থাকে যেন।"

ধনঞ্জয় ফটোটার দিকে তখনো নজর দেয় নি, নির্মলের কথা শুনছিল। নজর পড়াতেই মুখটা বিবর্ণ পাংশু হয়ে গেল কেন? মুখের রক্ত কে যেন এক নিমিষে নিংড়ে নিয়েছে সবটা।

ধনঞ্জয়ের মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে। একি সম্ভব? নয় কেন? বড়লোকের মেয়ে বড়লোকের ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ হবে—এতো চিরকালের নিয়ম।

দাঁতে দাঁত চেপে ধনঞ্জয় ফটোটা নির্মলের হাতে ফিরিয়ে দেয়—বলে—"আমাকে এর মধ্যে টানবেন না। আমি কি বুঝি। আমার কাছে সবাইকে সুন্দর মনে হোল। শুনেছি আসল চেহারা ফটোতে ধরা পড়ে না। তা আপনি নিজে চোখে দেখে আসুন না কেন?"

"তাই তো যাচ্ছি, তুমিও চল আমার সঙ্গে। সৌন্দর্যবিচার—এও ল্যাবরেটারীর কাজ বৈ কি। একি! তোমার মুখটা এত ফ্যাকাশে হয়ে গেল কি করে?" ধনঞ্জয় বিব্রত হয়। মুখ ফুটে বলে—

"আজকের দিনটা আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে এখুনি তৈরী হয়ে যেতে হবে। সাতটায় রেডিয়োর প্রোগ্রাম আছে—ভায়োলিনের।" ধনঞ্জয় উঠে দাঁড়ায়, স্থানত্যাগ করতে উদ্যত হয়।

"দাঁড়াও, মোটরে পৌঁছে দেব। অত ব্যস্ত কেন? আমরাও যাচ্ছি, পথে তোমাকে নামিয়ে দেব।"

"না না, আমাকে আজ মাপ করবেন।" ধনঞ্জয় কোন কথাই আর শুনতে রাজী নয়। তার মাথা ঘুরছে—টলতে টলতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। বিস্মিত নির্মল পাইপ কামড়ে হা করে চেয়ে থাকে।

অমলপ্রকাশের মনেও কি যেন স্মৃতির উদয় হয়। "লোকটিকে কোথায় যেন দেখেছি দেখেছি মনে হচ্ছে অথচ ঠিক স্মরণ করতে পারছি না। ভদ্রলোক কি করেন এখানে?"

"আমার এসিষ্ট্যান্ট, আগে বামায় কাজ কোরত। হয়ত বার্মায় দেখে থাকবেন কোথাও।"

"তাই বোধহয় হবে, কিন্তু আশ্চর্য। ভদ্রলোক অমনভাবে টলতে টলতে বেরিয়ে গেলেন কেন?" "কি জানি। ভারি আশ্চর্য মনে হচ্ছে।"...

নির্মল ডাক্তার নিজেই মোটর চালিয়ে যায়, পাশে বসে আছে চুপ করে অমলপ্রকাশ। দু একটা কথা নিতান্ত প্রয়োজনে বল্লেও নির্মলকে অন্যদিনের চেয়ে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর মনে হয়।

ফটোটা হাতে নেবার পর থেকে ধনঞ্জয়ের মুখের পরিবর্তন নির্মলের চোখ এড়িয়ে যায় নি। আরো বিস্ময়কর—হঠাৎ উঠে পড়ল কেন? নির্মলের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে ঘর ছেড়ে চলে গেল—কেমন যেন অস্বাভাবিক!...নির্মল মনে মনে আঘাত পায়, বিস্মিতও হয় আরো বেশী।

ধনঞ্জয় কি মেয়েটিকে আগে থেকে চেনে? ওরাও তো বর্মা থেকে এসেছে। তবে কি—?

—বাইশ—

ভবানীপুরে একটি তিনতলা নতুন রঙ্ করা বাড়ীর ফটকের সামনে এসে দাঁড়ায় গাড়ি।

বাড়ীর সামনে কিছুটা খালি জায়গায় ফুল বাগান। বনেদী কায়দায় আগেকার তৈরী বিরাট বাড়ী। মিঃ গুপ্ত বিবাহের সময় শ্বশুরের নিকট যৌতুক পেয়েছিলেন।

"অবশ্য আপনার টাকা পয়সার উপর লোভ থাকবার কথা নয়। তবে এ বাড়ী ছাড়াও জ্যেঠামশায়ের আরো দুটো বাড়ী আছে—সবই অশোকা পাবে। আর কেউ অংশীদার নেই। জ্যেঠাইমার নামে যে কোম্পানীর কাগজ কেনা ছিল তার মূল্যও দুলাখের উপরেই হবে।"

মোটর থেকে বেরিয়ে গেটে ঢুকবার সময় নির্মল বাড়ীটাকে এক নজরে দেখে নেয়। ফটকটি ভিতর থেকে তালা বন্ধ। রাস্তার ছাড়া ষাঁড় ও গরু ছাগল যাতে না ঢোকে, পাড়ায় খুব চুরি হচ্ছে সেজন্যও বটে। মোটরের আওয়াজ পেতেই দারোয়ান পাশের ঘর থেকে ছাতু মাখানো হাত নিয়েই দৌড়ে আসে। খুলে দেয় শিকল তাড়াতাড়ি।...

বাড়ীর সামনে ছোট্ট কেয়ারীকরা বাগান। নানা রঙের মরশুমী ফুল ফুটে আছে। পাশে সবুজ ঘাস ছাটা চমৎকার লন—তাঁর মাঝে সিমেণ্ট করা টেনিস কোর্ট। কিছুদূরে চাকর বাকরদের থাকবার ঘর। দুটো গরুও আছে দেখা যায়। একটা গরুর বোধ হয় বাচ্চা হয়েছে অল্প কয়েকদিন। বাচ্চাটি মনের আনন্দে লাফ মেরে খেলা করছিল। হঠাৎ টেনিস কোর্টের উপর গিয়ে প্রস্রাব করতে সুরু করে। অবিলম্বে হা হা করে ছুটে আসে উড়ে মালী।

নির্মল ডাক্তার চশমার আড়ালে স্মিতহাস্যে চেয়ে চেয়ে দেখে; মিঃ গুপ্ত ও হৃষীকেশ দে বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানান নির্মলকে। মিঃ গুপ্তের অমায়িকভাব যে কোন হবু শ্বশুরের অনুকরণ-যোগ্য।

বুড়োর দল অবশ্য অবিলম্বে অন্যত্র চলে যান। তরুণ তরুণীর ব্যাপার। অমল আছে, মীরা আছে—এরাই সব ম্যানেজ করবে—হৃষীকেশবাবুর সন্দেহ নেই। মিঃ গুপ্ত, রিটায়ার্ড জেলা জজ পান্নালাল ঘোষ, আরো কয়েকজন সঙ্গতিশালী, অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ ও প্রৌঢ়ের সম্মেলনে বৈঠকখানা গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। অল্পসময়ের মধ্যেই ব্রিজের আসর বসে যায়, দুই একজন বিলিয়ার্ড-ঘরের দিকে অগ্রসর হন।

নির্মলকে বসানো হয় অন্দরমহলের দিকে যেতে একটি অপেক্ষাকৃত ছোট ড্রয়িং-রুমে। রুচির পরিচয় দেওয়ালে দেওয়ালে, ছবির নির্বাচনে। এক কোণায় পিয়ানো। গিটার, বেহালা, বাঁশী—বাজনার ছড়াছড়ি—কোনটা ঝুলছে, কোনটা বা কাৎ হয়ে আছে। কিছুক্ষণ আগেও বোধ হয় বাজিয়ে গিয়েছে কেউ। ঠিকমত তুলে রাখতে ভুলে গিয়েছে।

"আপনার বোনটির বুঝি গান বাজনার দিকে ঝোক খুব ?"

"হ্যা অশোকা ভালই গান গায়, তবে বেহালার দিকে ঝোক হয়েছে অল্প কয়েকদিন হোল। ঐ যে বেহালাটা দেখছেন ওটা সেদিন কিনে এনেছে দু'শো টাকায়। ওটা নাকি একশো বছরের উপর পুরনো। বর্মার রাজনর্ত্তকী মাওরিণার প্রেমিক শ্রেষ্ঠ গায়ক থাকিন পোর নিজস্ব বেহালা। ঐ বাঁশীটা অশোকাকে উপহার দিয়েছিল একটি জংলী বর্মী। এ গিটারটা হালে কেনা।—এইযে! এত দেরী কেন ?"

নির্মল ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে যন্ত্রগুলো দেখছিল, হঠাৎ অমলপ্রকাশের কথার স্রোত বদলিয়েছে বুঝতে পেরে ফিরে তাকায়। বাঃ! এ যে অপরূপ সুন্দরী!

পর্দা ঠেলে সবে ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে মীরা। তার পরণে আট-পৌরে শাড়ী, হাতে শুধু ক'গাছা সোনার চুড়ী। রুজ বা পাউডার কিছুই ব্যবহার করে নি, তবুও কি রঙ, ঠোঁট দু'টো কি রাঙ্গা!

নির্মলকে হাতজোড় করে নমস্কার জানায় মীরা। নির্মল হাত তুলে প্রতিনমস্কার করে।

মীরা বলে—"বসুন, দাড়িয়ে রইলেন কেন আপনি?" গলার স্বরে বীণার ঝঙ্কার। নয় কি? নির্মল অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। এত অল্প সজ্জায় নারীকে এত সুন্দর দেখাতে পারে তা জানা ছিল না তার। তবে কি শাস্ত্রকার ভুল লিখেছেন—অলঙ্কারই নারীর ও সৌন্দর্যের প্রধান অবলম্বন?

নির্মলের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে মীরা চোখ তুলে তাকাতে পারে না। ফ্যানের হাওয়ায় চুলগুলো অনবরত উড়ে পড়ছে চোখের উপর। বার-বার হাত দিয়ে চুল সরাতে হয় মীরাকে। নির্মল নিঃশব্দে উঠে গিয়ে রেগুলেটর নাবিয়ে দিয়ে ফ্যানের গতি কমিয়ে আনে।

লজ্জায় মীরার গালটা ঈষৎ লাল হয়ে ওঠে, হাসিমুখে নির্মল ডাক্তারের দিকে চেয়ে বলে—"আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। আমি অশোকার দিদি হই সম্পর্কে। এখনি আসছে ও। আপনাকে প্রথমে একটু শরবত দিতে বলি কি বলেন?"

"শরবত! না, না, শরবত খাব কেন আমি?"

"যা গরম, তাই বলছিলাম।"

"গরমের বোধ কিন্তু সবাই এর সমান নয়। তাছাড়া গরমের মধ্যে চা খেয়ে দেখবেন তেষ্টা মিটে যাবে। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।"

"গরমকে একেবারে শঠ বানিয়ে দিলেন"—মীরা উঠে দাঁড়ায়—"আচ্ছা, চাই পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"না, না, আপনি বসুন, চা পরে হবে।"

মীরা অপ্রতিভভাবে পুনরায় আসন গ্রহণ করে। অমলপ্রকাশ অধীরভাবে বলে—"কৈ, অশোকা দেরী করেছে কেন ?"

চা, খাবার শরবত সব কিছু প্রচুর পরিমানে সাজিয়ে ট্রে হাতে আসে বয়। একে একে প্লেট, ডিস নামিয়ে হুকুমের অপেক্ষায় দরজার বাইরে গিয়ে টুলের উপর বসে পা দোলায়।...

মীরা চা ঢালে চার কাপে।

"চার কাপ কেন ?"—নির্মল সরলভাবে প্রশ্ন করে।

"ঐ যে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে অশোকা।" মীরা মুচকি হাসে।

নির্মল চুপচাপ বসে থাকে দেওয়ালের দিকে, কোন দিকেই যেন তার দৃষ্টি নেই। মীরা উঠে গিয়ে অশোকাকে হাত ধরে টেনে আনে। নির্মলের সামনে বসিয়ে দেয়।

—"ইণ্ট্রোডিউস করে দিতে হবে কি ?" মীরার চোখের কোণায় দুষ্টুমির হাসি।

নির্মল অশোকার দিকে না তাকিয়ে মীরাকে সম্বোধন করে বলে—"ওকে এখানে না বসিয়ে আসল জায়গায় বসালে ভাল হোত নাকি ?"

এবার অশোকা নিজেই উঠে গিয়ে পিয়ানোর কাছে বসে।

তার আঙুলের মৃদু স্পর্শে হঠাৎ ঘর ভরে ওঠে, বাজনা থামিয়ে মীরার দিকে ফিরে জিগ্যেস করে—"কি গান গাইব" ? মীরা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, "তা আমাকে জিগ্যেস ক'চ্ছিস কেন ? যিনি শুনতে চেয়েছেন তাঁকে বল্ না।"

নির্মল ততক্ষণে চা খেয়ে পকেট হাতড়ে আর একটা চুরুট ধরিয়েছে। সোফায় আরামের ভঙ্গীতে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে চুরুটে টান দেয়, ফাঁকে ফাঁকে অশোকা ও মীরা দুজনের চেহারা ও হাবভাব লক্ষ্য করে। একটা জিনিস সহজেই ধরতে পারে অশোকার মুখে আনন্দের দীপ্তি নেই। মীরার মতন সুন্দরী, হয়তো বা আরও সুন্দর তার নাক মুখ কিন্তু মুখের রঙটা এত বিবর্ণ কেন ? তবে কি অশোকা

এই বিয়ের প্রস্তাবে সুখী নয়? কি কারণ থাকতে পারে? তার পুরু চশমা? তাই বা কি করে কারণ হয়? মেয়েটি তো একবারও চোখ তুলে তাকালো না তাঁর দিকে।

অন্য কাউকে ভালবাসে কি? বাড়ীর লোকে বাধা দিয়েছে বুঝি? নিমেষের মধ্যে শত চিন্তা খেলে যায় নির্মলের মাথার মধ্যে।

অনেকক্ষণ কেউ কথা বলে না। ঘরটার আবহাওয়া যেন অস্বাভাবিকভাবে বদলে গিয়েছে। অশোকা মাথা নীচু করে বসে থাকে, মীরা এগিয়ে গিয়ে তার পিঠে হাত রেখে চুপি চুপি তিরস্কারের সুরে বলে—"কি হচ্ছে অশোকা!"

অশোকা তড়িতাহতের ন্যায় চমকে ওঠে। মীরার দিকে কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে বলে—"কি গান গাইব বলে দাও না।"

"যা তোর প্রাণ চায় তাই গা। আর দেরী করিস না। ভদ্রলোক কি মনে কচ্ছেন জানি না।" মীরা উদ্বিগ্নভাবে পিছন ফিরে দেখে নেয় নির্মল তাদের লক্ষ্য করছে কিনা।

নির্মলও সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়ালের দিকে চেয়ে আছে যেন—এই ভঙ্গীতে চুকটটায় আর একটা টান দেয়। অমলপ্রকাশ অসহায়ভাবে মাথা চুলকায়।

...অবশেষে কণ্ঠস্বর শোনা যায়। সহসা সুরে সুরে ভরে ওঠে ঘর।

"আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে।
আমার অনেকদিনের আকাশ চাওয়া আসবে ছুটে দক্ষিণ-হাওয়া,
হৃদয় আমার আকুল করে সুগন্ধধন লুটবে।
আমার লজ্জা যাবে যখন পাব দেবার মতো ধন,
যখন রূপ ধরিয়ে বিকশিবে প্রাণের আরাধন।
আমার বন্ধু যখন রাত্রিশেষে পরশ তারে করবে এসে
ফুরিয়ে গিয়ে দলগুলি সব চরণে তার লুটবে॥"

নাইটিংগেল পাখী কি কাঁটায় বুক রেখে গান গায় ? সুর কি গলে পড়ে কখনো ? সমাপ্তিহীন হতাশার মধ্যেও কি আশা বেচে থাকে ?

নির্মল ভাবে অন্যমনস্কভাবে। চুরুটের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উর্দ্ধে মিলিয়ে যায়।

বন্দিনী রাজকন্যা দূর-দুর্গের অন্ধকার গবাক্ষের পাশে দাঁড়িয়ে করুণস্বরে আবাহন জানায়ঃ "কোথায় আলোর ঝর্ণাধারা ?"

গান থেমে যায়। অশোকা তবুও বসে থাকে নিশ্চল জড়মূর্তির ন্যায় টুলের উপর।

"আর একটা গান গা ?" মীরা অনুরোধ করে।

"না থাক।" নির্মল উঠে এসে নিষেধ করে, অশোকাকে নমস্কার জানায় বলে—"এই যে অশোকা দেবী, আপনি কিন্তু আমার সঙ্গে এখনো পর্যন্ত একটা কথাও বলেন নি। আসুন আমরা ঐ বারান্দাতে যাই। বাইরের খোলা হাওয়ায় আপনার ভাল লাগবে।"

অশোকা উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিনমস্কার করে, ক্ষীণকণ্ঠে মাটির দিকে চোখ রেখে বলে, "চলুন।"

মীরা অমলপ্রকাশকে চোখের ইঙ্গিতে ঘরের বাইরে যেতে নির্দেশ করে। নিজেও বেরিয়ে যায়।

বারান্দায় অনেকগুলি অর্কিড টানানো। দুটো বেতের চেয়ারে পাতা ছিল আগে থেকেই। দুজনে বসে।

অশোকা সুইস টিপে আলো জ্বালায়। নির্মল আপত্তি করে, বলে—"আলোটা নিবিয়ে দিন। আলোতে আপনারি কষ্ট হবে বেশী।"...

ভদ্রলোক যেন কেমন অদ্ভুতপ্রকৃতির। কতকটা কুতজ্ঞচিত্তেই সুইসটা পুনরায় টেনে নাবিয়ে দেয় অশোকা।

বারান্দার নীচু দিয়ে লাল সুরকীর রাস্তা বাড়ীটার দুইদিক ঘুরে এসে মিশেছে টেনিসকোর্টের দিকে। বেলফুলের গন্ধ নাকে আসে।

"আপনি কি ফুল ভালবাসেন ?"

"হ্যাঁ"

"গান ?"

অশোকা কোন উত্তর দেয় না। নির্মল নিজেকে সংশোধন করে বল্লে—"এই দেখুন, বোকার মতন প্রশ্নটা করেছি। আপনি যে গান ভালবাসেন সে তো আপনার ঘরে ঢুকেই বোঝা যায়। তা এত বাজনা যোগাড় করলেন কি করে ?"

অশোকার গলা শুকিয়ে আসে। সে যে কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। শুধু করুণভাবে নির্মলের চোখের দিকে চায় একবার, তারপর মাথা নীচু করে আঁচল নিয়ে জট পাকায়।

"থাক থাক। সব প্রশ্নের যে উত্তর দিতে হবে তার কোন মানে নেই। আমি প্রশ্ন করে যাই, আপনি যেটার ইচ্ছে উত্তর দিন।"

একটু থেমে আবার বলে—

"আচ্ছা একটা প্রশ্ন করব। যদি ঠিক ঠিক উত্তর দেন তাহলে সব সমস্যারই সমাধান হয়ে যায়। আপনারও মঙ্গল, আমারও মঙ্গল।"

নির্মলের কণ্ঠস্বরে আশ্বাস।...

অদ্ভুত ধরণের লোকটির উপর অশোকার মনে কেন জানি শ্রদ্ধা জাগে। এত বিদ্বান, ধনী, কৃতী হয়েও কোন অভিমান নেই। অন্যের ব্যবহারের ত্রুটিও ক্ষমার চোখে দেখেন, কৃতজ্ঞতায় মন ভরে ওঠে অশোকার।...

এই লোকের সঙ্গে সারাজীবন যদি কাটাতে হয় সে কি সুখী হবে না ? না, না, এ তার ভীষণ অন্যায়। সহজ হবার চেষ্টা করে অশোকা, বলে—"চলুন, ঘরে গিয়ে বসা যাক। আপনাকে গান শোনাবো। ওরা হয়ত অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।"

"কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর তো এখনো আপনি দেন নি ?"

"কি প্রশ্ন বলুন ?"

"আমার সঙ্গে আপনার জীবন যদি একসূত্রে যুক্ত হয়ে যায়, সারা জীবন ধরে কি এই অবস্থাকে কি খুসী মনে মেনে নিতে পারবেন ?"

অশোকা তৎক্ষণাৎ উত্তর করে—"পারব।"

"তাহলে চল—ভিতরে গিয়ে বসা যাক্‌। তোমার গান এখনো শোনা বাকী আছে। যা গেয়েছো ওটা কান্নার গান। আনন্দের সুর ধরো এবার।"

ঘরে গিয়ে বসে দুজন। মীরা ও অমলপ্রকাশ পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে যোগ দয়।

অশোকা আবার পিয়ানোর কাছে উঠে যায়, ম্লান হাসি হেসে বলে—"আজকে গলায় কেন জানি না সুর আসছে না, তার চেয়ে বাজনা বাজাই শুনুন।"

"আচ্ছা তাই সই।"...

পিয়ানোর সুরের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি সুরের তরঙ্গ মিলিত হয়। সামের বাড়ীতে রেডিয়োর দোকান। লাউডস্পীকারের কর্কশ বহিরাবরণ ভেদ করে ভেসে আসে অদ্ভুত সুরেলা বাজনা। করুণ সুর যেন সহসা মূর্ত হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে আধার। অশরীরী আত্মার যুগযুগান্তব্যাপী ব্যর্থ নিবেদন।

অশোকার কি হোল ? হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েছে পিয়ানো ছেড়ে। উৎকর্ণভাবে শুনছে রেডিয়োর বাজনা।

কোন দিকে যেন আর তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

"আছেন—বেঁচে আছেন। এই সুরে বেহালা বাঙলাদেশে কে বাজাবে ?"

কি বলছে অশোকা ? একি কোথায় যাচ্ছিস ?"

"আসছি.........

মীরা ও অমলপ্রকাশ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। নির্মলের মনে কিন্তু কোন ভাবান্তর নেই। সামনের টেবিলের উপর

কাগজটা টেনে রেডিয়ো নিউজটা পরীক্ষা করে দেখে, হাতঘড়িটাও দেখে নেয়।

ধনঞ্জয় বোসের বেহালা সাতটা কুড়ি মিনিটে। ধনঞ্জয়! মানে তারই সহকারী ধনঞ্জয়! অশোকার ফটো দেখে যে চমকে উঠেছিল! মুখের উপর ফুটে উঠেছিল আকস্মিক আঘাতের বেদনাময় অভিব্যক্তি। আসতে চায়নি কিছুতেই তার সঙ্গে! এই জন্যে ?...বুঝলাম।

ব্যাপারটা নির্মলের কাছে জলের মতন পরিষ্কার হয়ে যায়। তার মুখটা গম্ভীর হয়ে আসে।

মীরাকে সম্বোধন করে বলে নির্মল—"আর এক কাপ চা দিতে বলুন।"

মীরা অপরাধীর মতন হাত কচলায়—"নির্মলবাবু, দয়া করে কিছু মনে করবেন না। অশোকার মনটা একটা ব্যাপারে কয়দিন থেকে খুব চঞ্চল ছিল। তাই বোধ হয় কোন শক পেয়ে—"

"শক পেয়ে মাথার গণ্ডগোল হয়েছে। এই না ?—না না, ওঁর মাথা ঠিকই আছে। আপনি অনুগ্রহ করে আমার জন্য আর এক কাপ চা আনিয়ে দিন। তারপর—যদি আপত্তি না থাকে—চলুন—আমার সঙ্গে বেড়িয়ে আসবেন। আপনাকে আমার একটু প্রয়োজনও আছে। অমলবাবু—আপনাকেও যেতে হবে আমাদের সঙ্গে।"

মীরা ও অমল হতবুদ্ধির মতন নির্মলের দিকে চেয়ে থাকে। মীরা উঠে যায়, বয়কে নতুন করে চা দিতে বলে। বাড়ীটা ঘুরে এসে জানায় অশোকাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।

উদ্বিগ্ন অমল বলে—"তাহলে এখুনি জ্যেঠামশায়কে আর বাবাকে খবরটা দেওয়া দরকার।"

নির্মল আঙুল নেড়ে নিরস্ত করে দু'জনকে।

"বসুনতো আপনারা চুপ করে ঐখানটায়। আমি চা খেয়ে নি ততক্ষণে। আপনারাও আর এক কাপ খান না কেন? কেটলিতে

এখনো অনেকটা জল আছে, আরো দুকাপ হবে—নিন। আমি তৈরী করে দেব ?"

"না না, করেন কি ! আমি তৈরী করে দিচ্ছি।"

"আপনি বড় নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। আমি জানি আপনার বোন কোথায়।"

"কোথায় ?"

"ধনঞ্জয় বোসের কাছে।"

"ধনঞ্জয় বোস !"

"হ্যাঁ, ধনঞ্জয় বোস—রেডিয়োতে এইমাত্র ভায়োলিন শুনছিলেন—ধনঞ্জয় বোসের বাজনা। আমারই সহকারী, ল্যাবরেটারীতে কাজ করে। কিন্তু—ট্যাকসি করে গেলেও রেডিয়ো-স্টেশন পৌঁছুতে না পৌঁছুতে ধনঞ্জয় বেরিয়ে পড়বে। উনি হয়ত দেখা পাবেন না, হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরবেন। যাই হোক, চলুন আমার সঙ্গে—ধনঞ্জয়ের বাড়ীর ঠিকানা আমার জানা আছে। ব্যাপারটা খোলসা করে জানা দরকার।"

"ধনঞ্জয় বোস বলে তো অশোকার পরিচিতের মধ্যে কেউ নেই। একথা তো আমি কোনদিন শুনি নি। নিশ্চয় আপনি ভুল করছেন। আমার কাছে অশোকার গোপন কোন কিছুই নেই।" মীরা উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে।

নির্মল শান্তদৃষ্টিতে গম্ভীরস্বরে প্রশ্ন করে—"তাহলে আপনি বলতে চান বেহালা বাজাতে জানে, এবং সুন্দর বেহালা বাজায় এমন কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে অশোকাদেবীর আলাপ ছিল না !"

"হ্যা—না—তা—ছিল—কিন্তু—তাঁর নাম তো অলোক রায়। তিনি তো বোমায় মারা গিয়েছেন বেসিনের রাস্তায়।"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান, ধীরে, আরো ধীরে ! কি বল্লেন—অলোক রায় ? চেহারা কি রকম ? দেখেছেন তাঁকে ?"

"হ্যাঁ, একবার মাত্র দেখেছি—দাড়ি-গোফ-ভর্তি মুখ, জামাকাপড় সব ময়লা ছিল তখন—একমাস পথে পথে কাটিয়ে সবে তারা আমাদের বাসায় পৌঁছেছেন, চেহারাটার হয়ত যথাযথ বর্ণনা দিতে পারব না। তবে তার কপালের এক কোণে একটা কাটা দাগ ছিল, রং খুব ফর্সা, উঁচু লম্বা ধরণের চেহারা—সুন্দর দেখতে।"

"ঠিক আছে, অলোক রায়ও ধনঞ্জয় বোস হতে পারে। হতে পারে না—এমন কোন প্রমাণ আছে কি আপনাদের কাছে?"

"প্রমাণ! প্রমাণ আর কি চান? প্রমাণ—মৃত ব্যক্তি তো আর ভূত হয়ে অন্য নাম নিয়ে বাজনা বাজিয়ে বেড়াবে না। আর নাম বদলাবেই বা কেন?"

"সত্যিই যে অলোক রায় মারা গিয়েছেন তা জানলেন কি করে?"

"ঐ দেখুন—আপনার সামনেই বেহালাটি ঝুলছে দেওয়ালে, ঐ বেহালাটিই সাক্ষী। অলোকবাবুর বেহালা ওটা, অশোকা ওটা একটা দোকান থেকে কিনে এনেছে। দোকানদার ভদ্রলোক আগে বেসিনে থাকতেন, কাঠের কারবার ছিল। উনি কেনেন এক ঝাড়ুদারের কাছ থেকে। ঝাড়ুদার স্বচক্ষে দেখেছে অলোকবাবু মরে পড়ে আছেন নর্দমার পাশে। বেহালাটা ছিটকে পড়েছিল একটু তফাতে।"

"বটে, তাহলে তো ভাবনার কথা। চলুন, আর দেরী করা উচিত নয়।"

"জ্যেঠামশাইকে একবার বলা দরকার নয় কি?"

"না বুড়োমানুষ, হঠাৎ এই খবর পেলে নিজেকে সামলাতে পারবেন না। এমন সব কাণ্ড করে বসবেন, যে সারা সহরে টি টি পড়ে যাবে। আপনার বোনের এতে ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না।"

মীরা কোন কথাই আর বলতে পারে না। নির্মলের পিছন পিছন নেমে যায়। অমলপ্রকাশও নিস্তব্ধভাবে যন্ত্রচালিতের ন্যায় সঙ্গে চলে।...

গাড়ি চলে ফুলস্পীডে। নির্মলের অনুরোধে পাশে বসেছিল মীরা। এক হাতে ষ্টিয়ারিং, আর এক হাতে চুরুট, নির্মলের প্রশ্ন শোনা যায় "...হু...তারপর ?...হ্যা...তারপর ?"...

এতক্ষণ দৃষ্টি ছিল সামনের দিকে, সহসা পাশে বসা মেয়েটির চোখে চোখ রাখে নির্মলডাক্তার। মোড় ঘুরতেই গাড়ীর স্পীড কমিয়ে বলে—"মীরাদেবী, আপনারো কি বার্মার কারুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো ?"

মীরা হেসে উত্তর দেয়, "কেন বলুন তো, এই প্রশ্ন হঠাৎ।"

নির্মল স্পীড বাড়াতে বাড়াতে বলে—"এমনি জিগ্যেস করলাম, কারণ কিছু নেই !"...

গাড়ির জানালার বাইরে তাকায় মীরা। গড়ের মাঠে গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ইলেক্‌ট্রিক আলো।

—তেইশ—

গেট পার হয়ে খানিকটা হেঁটে যেতে হয় অশোকাকে। ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ডে একটা ট্যাক্সিও নেই।

রাস্তা দিয়ে চলেছে জনস্রোত। অশোকা হাঁটতে থাকে উদ্‌ভ্রান্তের মতন। চুলগুলো খোঁপা খুলে পিছনে পড়েছে, কয়েকটি কলেজের ছাত্র হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল, তারা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

একটা ট্যাক্সি উল্টোদিক থেকে আসছে না? ট্যাক্সি! ঘ্যাঁচ্ করে থেমে যায় গাড়িটা। হিন্দুস্থানী ড্রাইভার দরজা খুলে দেয়।

ডালহৌসি?

রেডিয়ো স্টেশন?

গাড়ী স্পীড নিতে দেরী করে।

জলদি করো—বকশিস্ পাবে।

বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী ড্রাইভার রামদীন দুবে রেস বাড়িয়ে দেয়। বাতাসে তার টিকিটা দুলতে থাকে। গাড়ি যেন ছুটে চলেছে নক্ষত্রবেগে—ল্যান্সডাউন রোড ধরে। এ্যাক্সিডেণ্ট হতে হতে বেঁচে যায় একবার। আশঙ্কায় রেস কমিয়ে দেয় ড্রাইভার।

এ যে ছ্যাকড়া গাড়ির মতন চলছে!

ড্রাইভার, আরও জোরে, আরও বেগে চালাও। নইলে—।

কিন্তু ষাটবছরের বৃদ্ধ ট্যাক্সিচালক মনস্তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামায় নি কোন দিন। তাই শুধু ঘাড় নেড়ে জানায়—খুব জোরেই সে চালিয়ে যাচ্ছে—আরো জোরে চালালে গাড়ী উল্টে যাবে।

...সামনেই আবার গাড়ি আটকায় লাল বাতি! কি মুস্কিল! টিক! টিক! টিক!...ধুক! ধুক! ধুক!—সামান্য কয়েকটি

মুহূর্তও পার হয়ে যায় নি—অশোকার মনে হয়—অনেক, অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে। কি জ্বালা!...সবাই কি ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছে আজকে, এই সময় ?

"ড্রাইভার, চালাও, দেরী কোরো না—এই নাও নেকলেশ—এটা তোমাকে দিলাম। পুলিশ ফাইন করুক, নেকলেশের দাম অনেক, তোমার কোন লোকসান হবে না। চালাও—চালাও—আর দেরী কোরো না।"

হতবুদ্ধি রামদীন দুবে নেকলেশটা হাতে নিয়ে এক সেকেণ্ডের জন্য বিহ্বল হয়ে যায়। এ যে হীরে বসানো নেকলেশ। দুই তিন হাজার, কি তারও বেশী দাম!

গাড়িতে স্টার্ট দেয় রামদীন, কিন্তু পুলিশ আইন অমান্য করতে হয় না তাকে, কারণ হলদে আলো নীল হয়ে গিয়েছে ততক্ষণে!

গাড়ি চলেছে আবার। ড্রাইভার ভাবে এই বুঝি আরোহিণী নেকলেশটা ফিরে চায়। একবার ভাবে চাওয়ার আগেই ফিরিয়ে দি। কিন্তু তার আর সুযোগ দেয় না অশোকা। তার খেয়ালই নেই অন্য কোন দিকে। নেকলেশের কথা একবারও মুখে আনে না। রেডিয়ো-স্টেশনের নিকট এসে যখন গাড়ী থামে, নেমে যায় অশোকা একলাফে। মনিব্যাগ খুলে তাড়াতাড়ি ভাড়াটা চুকিয়ে দেয়, আর কিছুই বলে না, চায় না ফিরে কিছুই। এগিয়ে যায় হন্ হন্ করে। খানিকটা পথ হেঁটে যেতে হবে এখনো।

ড্রাইভার একটুখানি অপেক্ষা ক'রে গাড়িতে স্টার্ট দেয়। নতুন ভাড়াটের পর আজ আর তার লোভ নেই। কখন ফিরে যাবে বাসায় তাই প্রধান চিন্তা।

পথে যেতে যেতে ড্রাইভার ভাবে রেডিয়ো স্টেশনে এই সুন্দরী বাঙ্গালী মেয়েটির কি এমন তাড়াতাড়ি ছিল ? অতো দামের নেকলেশ

খোয়া দিয়েও পেঁছিতে হবে! এতো জরুরী কাজ! নাঃ—বংগালীবাবু আর বংগালী লেড়কির মাথায় আজকল্ বহুৎ গড়বড় হোচ্ছে—রামদীনের আর সন্দেহ নেই।

রেডিয়ো ইষ্টিশান!...হরবখত গানা বাজানা...স্রিফ গণ্ডগোল আছে—থুক্। মুখ থেকে খৈনি ফেলে দেয় জানালা গলিয়ে।

—চব্বিশ—

এনকোয়েরি অফিসে অশোকা অলোক রায়ের খোঁজ নেয়।

"আচ্ছা বলতে পারেন—অলোক রায় বলে যিনি একটু আগে ভায়োলিন বাজালেন তিনি কি—এখনো আছেন না চলে গিয়েছেন?"

কর্মচারী "বেতারজগৎ" হাতড়ে উত্তর দেয়—"কৈ, অলোক রায় বলে কারো নাম তো দেখছি না—ধনঞ্জয় বোসের ভায়োলিন ছিল—সাতটা কুড়িতে। আপনি কাকে চান?

ধনঞ্জয় বোস! অলোক রায় নয়! বিবর্ণ মুখে বেরিয়ে আসে অশোকা। কে যেন বুলেট দিয়ে আঘাত করেছে অশোকাকে। তার মুখ দিয়ে কথা বের হয় না আর। এনকোয়ারি অফিসের কর্মচারী বিস্মিতভাবে চেয়ে থাকে। কি ভেবে আবার ফিরে আসে অশোকা। বিহ্বল ভাবে প্রশ্ন করে—"ঠিক জানেন ধনঞ্জয় বোস?" "হ্যাঁ, এই দেখুন না—বেতার জগৎ।" "দয়া করে ওঁর ঠিকানাটা দিতে পারেন?" "বসুন, দেখছি।" ঠিকানাটা কাগজে লিখে নিয়ে অশোকা বেরিয়ে আসে পুনরায়।

অশোকা! অশোকা!...তাকে কি ডাকছে কেউ? না, না—ভুল —শুধু ভুল, আজকে শুধু ভুলই হচ্ছে বার বার। পাগলের মত ছুটে এল কেন সে? সত্যিই তো। যে মরে গিয়েছে একবার, সে আবার কি করে ভায়োলিন বাজাবে? ধনঞ্জয় বোস—ধনঞ্জয় বোস এ সুর জানলেন কি করে? তবে কি ভুল শুনেছে?

এতক্ষণে অশোকার নেকলেশটার কথা স্মরণ হয়। অনেক দামী নেকলেশটা অকারণ খোয়া গেল। ক্ষণিকের উত্তেজনায়। বাবা জানতে পারলে ভীষণ রাগ করবেন।

ছিঃ ছিঃ, নির্মলবাবু, মীরাদি, অমলদা এঁরা কি মনে করলেন ? কি আর মনে করবেন ?...মাথা খারাপ...

নির্মলবাবু নিশ্চয় রাগ করে বাড়ী চলে গিয়েছেন ! সম্মানিত নিমন্ত্রিত অতিথি, যার সঙ্গে বিয়ের কথা একপ্রকার পাকাপাকি তাকে—

অবজ্ঞা ! কাকে অবজ্ঞা ? কৈ, তার তো কিছুই চৈতন্য ছিল না তখন। অন্য কারুর কথাই মনে হয় নি। কিন্তু কে বুঝবে অন্তরের কথা ?...

পাগল, পাগলের মতন ছুটে চলে এসেছে, দিগ্বিদিক কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে। এমন বোকার মতন কাজ হঠাৎ সে কি করে ক'রল—ভেবেও ঠিক করতে পারে না অশোকা।

হঠাৎ বেহালার সুর শুনে সব ভুল হয়ে গিয়েছিল। এ সুর সবাই এর জানবার কথা নয়। বর্মার সাপুড়ে গানের সুর। এই সুরেই মংবা বাঁশী বাজিয়েছিল। নৌকোতে অলোকবাবু এই সুর তুলেছিলেন বেহালার তারে। কি করে রেডিয়োতে ভেসে আসল সেই সুর ? ধনঞ্জয় বোসও কি বর্মা থেকে এসেছেন ? তিনিও কি এই সুর জানেন ?

সামনেই খবরের কাগজ ছিল, বেতার জগৎও ছিল, নামটা দেখে নিলেই হোত। কিন্তু—কিন্তু—তখন বিচার করবার ক্ষমতা ছিল কি তার ? ধনঞ্জয় বোসের খোঁজ করলে হয় না ? না, না—লাভ কি ?... ঈস্! বাড়ীর সবাই এখন কি ভাবছে !

লজ্জায় অশোকার মনে হয় 'ধরণী দ্বিধা হও'। পথে টলতে টলতে অন্যমনস্কভাবে রাস্তা পার হয়। হঠাৎ একটা চলন্ত ট্যাক্সি এসে পড়ে সামনে। ব্রেক কষতে না কষতে ধাক্কা খেয়ে অশোকা ছিটকে পড়ে রাস্তার 'পর।

ব্ল্যাক-আউটের রাত্রি।

রাত্রিবেলা ডালহৌসি অঞ্চল অপেক্ষাকৃত নিরালা। রাস্তায় বেশী লোক চলাচল নেই। তাই লোকজন জড়ো হয় না বিশেষ। নির্মল

গাড়ী চালিয়ে আসছিল রেডিয়ো স্টেশন লক্ষ্য করে। উল্‌টো দিক থেকে একটা খালি ট্যাক্‌সি আসছিল। তারি ধাক্কায় অশোকা আহত হয়েছে। পুলিশ আসতে না আসতে নির্মল ও অমল ধরাধরি করে মূর্চ্ছিতা অশোকাকে গাড়িতে তুলে নেয়।

মীরা প্রথম বুঝতে পারেনি কে চাপা পড়ল।...

...একি, এ যে অশোকা!

...নির্মলের কপালে ঘাম দেখা দেয়।

মীরা কাঁদতে থাকে।

অশোকার চিবুক বেয়ে রক্ত পড়ছিল, কিছুতেই রক্ত বন্ধ হতে চায় না যেন। রক্তে যেন ভেসে যাচ্ছে। নির্মলের দামী স্যুটটায় রক্তের ছোপ লেগে যায়। অমলের শার্টেও দাগ লাগে।

গাড়ীর মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে নির্মল গম্ভীর বিষন্নকণ্ঠে বলে—"অমলবাবু, মেডিকেল কলেজে যাবো, না আমার বাড়ীতে? আমার বাড়ী কিন্তু আরো কাছে। ব্যবস্থার ত্রুটি হবে না, তাছাড়া আমি সব সময় দেখতে পাবো।"

অমল বিহ্বলভাবে বলে, "আপনি ডাক্তার, যা ভাল বোঝেন করুন, আমি আর ভাবতে পাচ্ছি না। বাবাকে আর জ্যেঠামশায়কে একটা টেলিফোন করা দরকার। আমাকে নামিয়ে দিন, আমি সামনের কোন দোকান থেকে টেলিফোন করি।"

ষ্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে নির্মল বলে—"ব্যস্ত হবেন না। বাড়ীতে গিয়েই টেলিফোন করা যাবে। আঘাতটা খুব সিরিয়াস নয় বলেই মনে হয়। আপনি বরং ঐ পানওয়ালার দোকান থেকে খানিকটা বরফ কিনে আনুন, নেমে পড়ুন, শীগ্‌গির যান।"

অমলপ্রকাশ দৌড়ে যায় পানওয়ালার দোকানে, বরফ নিয়ে মোটরে ওঠে,—মোটর আবার স্টার্ট দেয়।

—পঁচিশ—

নির্মলডাক্তার ওষুধ ঢালে ছোট্ট গ্লাসে। অশোকার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ওষুধ খাইয়ে দেয় এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নার্স।...

দোতালার প্রকাণ্ড হলঘরের পাশের ঘরটি মাঝারী সাইজের। কোনের ঘর—আলো বাতাস সব চেয়ে বেশী আসে এই ঘরে। তাই এই ঘরটাই অশোকার জন্য নির্মল নির্বাচন করে!

নার্স আসে, কন্‌সালটিং ডাক্তার আসেন। বিলেতী টাইটেল বিশিষ্ট নামকরা সার্জন আসেন—অনেকেই নির্মলডাক্তারের ঘনিষ্ঠ পরিচিতের মধ্যে।

নির্মল নিজহাতে ব্যাণ্ডেজ করে। আঘাত কিছুটা গভীর হলেও নাকি মারাত্মক নয়, তবে সারতে একটু সময় নেবে। শুধু ভয়—টেম্পারেচার উঠেছে—রোগিণী মাঝে মাঝে ভুল বকছে—ব্রেন ফিবারে না দাঁড়ায়।

বাড়ীটা যেন ছোটখাটো একটা হাসপাতালে পরিণত হয়েছে। মিঃ গুপ্ত ও হৃষীকেশবাবু টেলিফোন পেয়েই সেই রাত্রেই উপস্থিত হন।

মিঃ গুপ্ত প্রশ্ন করেন—"কি ক'রে চাপা পড়ল অশোকা? রাস্তায় বের হ'ল কখন? কিছুই তো বুঝতে পারছি না আমি।"

নির্মল গম্ভীরভাবে উত্তর দেয়—"আমিও কিছু বুঝতে পারি নি এখনো। কেন যে ঘর ছেড়ে গেলেন, সবই রহস্যে ভরা মনে হচ্ছে। রেডিয়োর ভায়োলিন বাজনা শুনে তার মনটা প্রথম চঞ্চল হয়ে ওঠে। আচ্ছা, বার্মায় থাকতে ধনঞ্জয় বোস বলে কি কারুর সঙ্গে আপনাদের জানাশুনো ছিল? ধনঞ্জয় বোসই কিন্তু সেই সময় ভায়োলিন বাজাচ্ছিল রেডিয়োতে।"

"ধনঞ্জয় বোস! ভায়োলিন! মানে—মানে বেহালা...কৈ, না।"

"আপনার মেয়ে হয়তো চিনতেন।"

"না, না, কি বলছ তুমি!—আমার মেয়ে অশোকা—আমার হাতে গড়া—না, না, এ একেবারে মিথ্যে—আমি খুব জোর গলায় বলতে পারি।"

"আমি কোন ইঙ্গিত করে কথাটা বলি নি। এমন তো হতে পারে—আপনারা বার্মা থেকে পথে হেঁটে আসছিলেন সেই সময় ধনঞ্জয় বোস আপনাদের সাহায্য করে।"

"না না—ধনঞ্জয় বলে কেউ আমাদের কোনদিন সাহায্য করে নি।"

"ধনঞ্জয়কে ডাকতে পাঠিয়েছি—এখুনি এসে পড়বে। আমারি ল্যাবরেটারীতে কাজ করে। সে কিন্তু আগে বার্মায় ছিল। গ্রুপ ফটোটা ওর হাতে দিয়েছিলাম—আপনাদের ওখানে যাবার আগে—ও কেন চমকে উঠল? আমার সন্দেহ হচ্ছে ও আপনাদের চেনে।"

ভাবী বেয়ান নির্মলের মা মহামায়া দেবীও নিকটে বসে আছেন, সব শুনছেন—ভাবী জামাইএর কথাবার্তায় মিঃ গুপ্ত অস্বস্তি অনুভব করেন।

নির্মল তখনো বলে চলে—"আপনার মেয়ে কেন ছুটে গেলেন রেডিয়ো স্টেশনে? আপাততঃ বিস্ময়কর হলেও এর একটা কারণ ছিল নিশ্চয়ই। আর একটা কথা, ধনঞ্জয়ের বেহালার সুর কানে যেতেই হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন, আনমনে বল্লেন, বেঁচে আছেন, তারপর আর কিছু না বলেই বেরিয়ে পড়লেন ঘর ছেড়ে। এমন তো হতে পারে ধনঞ্জয়ের সঙ্গে আপনাদের দেখা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু আপনার ঠিক স্মরণ নেই নামটা।"

মিঃ গুপ্ত সহসা কোন উত্তর দিতে পারেন না। চমক ভেঙ্গে ক্ষীণ-কণ্ঠে তখনো প্রতিবাদের সুরে জানান—"না, না, নির্মল, তোমার ভুল। ভাংচি দেবার জন্য কেউ হয়তো তোমার কাছে গল্প বানিয়ে বলেছে।

ধনঞ্জয়—ধনঞ্জয়—আমার কখনো নামের ভুল হয় না—কস্মিন কালে এই নামের কাউকেই আমরা চিনি না।"

চাকর এসে জানায়—'ধনঞ্জয়বাবু নীচে অপেক্ষা ক'রছেন। তাঁকে উপরে নিয়ে আসবো কি ?"

"হ্যাঁ নিয়ে এস, এখানেই নিয়ে এস।" নির্মল অন্যমনস্কভাবে ঘরে পায়চারি করে। মিঃ গুপ্ত রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করেন। মীরা ও অমলপ্রকাশের চোখে মুখে বিস্ময় ও কৌতূহল। মহামায়া দেবীর ঠোঁটের কোণায় শুধু ম্লান বিষন্ন হাসি। তিনি শুধু ধীরে ধীরে প্রশ্ন করেন নির্মলকে লক্ষ্য করে—"কে রে নির্মল ?"

"আমার ল্যাবরেটরীতে কাজ করে, ধনঞ্জয় বোস—আগে বার্মায় থাকত। মামাবাবুর সঙ্গে ওর চেহারার আশ্চর্য মিল দেখে আমি ওর ওপর আকৃষ্ট হই ; আচ্ছা মা, তুমি ঠিক জানো মামাবাবুর ছেলে বেঁচে নেই ? এই যে ধনঞ্জয় ! এস, এস।"

লম্বালম্বা চুল, ঘন কালো, কোঁকড়ানো, কপালের আশে পাশে ঝুলে পড়েছে, দাড়ি গোফ কামানো, ফর্সা পাঞ্জাবী পরা—ধনঞ্জয় ওরফে অলোক উদ্বিগ্নভাবে প্রবেশ করে। মুখের উপর আলো পড়ায় চক চক করে মুখটা। সবাইএর দৃষ্টি তার দিকে।

পুরুষ দেহের এমন সুন্দর সবল ভঙ্গিমা সহসা নজরে আসে না।

"আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন ? রাত্রে কি ল্যাবরেটারীর কাজ করবেন ?"

নির্মল স্মিতহাস্যে আমন্ত্রণ জানায়—"এসো ধনঞ্জয়, এইখানটায় বোসো। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই—আমার মা, আজকে এসেছেন কাশী থেকে—বিকেলে। এ কি আপনারা !—"

বজ্রাঘাতও বোধ হয় মানুষকে এতখানি নির্বাক করে নি কখনো। কি হলো এদের ? নির্মলও বিস্মিত হয় খুবই।

মীরা অভিভূতভাবে দু'হাত দিয়ে চোখ রগড়ায়। এও কি সম্ভব অলোকবাবু বেঁচে আছেন ? ধনঞ্জয় বোস নাম কেন তাহলে ?

মিঃ গুপ্তের ভ্রূকুটি নির্মলের দৃষ্টি এড়ায় না। নির্মল বেশ বুঝতে পারে, মিঃ গুপ্ত ধনঞ্জয়কে বেশ ভাল ভাবেই চেনেন।

কিন্তু মার মুখ সহসা এত বিবর্ণ হয়ে গেল কি করে ? কেন ?

ধনঞ্জয় হলঘরের মাঝামাঝি এসে মহামায়া দেবীর পায়ের ধূলো নেয়। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মিঃ গুপ্তকে হাতজোড় করে নমস্কার জানায়।

মিঃ গুপ্ত নমস্কারের প্রতিদানে মাথাটি পর্যন্ত দোলান না। রাগে, বিরক্তিতে তাঁর গলার শিরটা পর্যন্ত ফুলে উঠেছে।

নির্মল বিব্রতভাবে একবার এদিক, আর একবার ওদিক তাকায়। কিছুই বুঝতে না পেরে সোজাসুজি ভদ্রলোককে সম্বোধন করে বলে—"ধনঞ্জয়, তুমি কি খেয়ে এসেছ ?"

"না।"

"এইখানেই খেও আজ রাত্রে। আজকের রাতটা একটু জাগতে হবে, তাই তোমাকে আনিয়েছি। মা! এই সেই ধনঞ্জয় যার কথা—ওকি—ওরকম ক'রছ কেন ? শরীর খারাপ ? মাথা ঘুরছে ?—একি! মা! মা!! গনপৎ! গনপৎ!! পানি! পানি লাও জলদি! ধনঞ্জয়! স্মেলিংসল্ট শিশিটা—শীগ্‌গির—"

মহামায়া দেবী সোফার উপরেই অজ্ঞানের মতন এলিয়ে পড়েছেন। নির্মলের উঠে আসবার আগেই মীরা লুটিয়ে পড়া মাথাটি কোলের উপর তুলে নিয়েছে।

গণপৎ জল নিয়ে আসে। নির্মল চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে থাকে। মিঃ গুপ্ত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর হাত থেকে পাইপটা টিপয়ের উপরে পড়ে যায়, তবুও তিনি সেটা কুড়িয়ে নেবার কথা ভুলে যান।

একি অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে চলেছে!

কোথায় মেয়ের বিয়ে একরকম ঠিকঠাক, তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলেন বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মনের আনন্দে ব্রিজ, বিলিয়ার্ড নিয়ে দিন কাটাবেন, আর সেই সময় কিনা এই সব বিঘ্ন সুরু হোল।

ধনঞ্জয় বোস—কি আশ্চর্য! নাম ভাঁড়িয়েছে কলকাতায় এসে! নিশ্চয় স্মাগলার্সের দলে আছে ও, কি জানি জাপানী স্পাইও হতে পারে। অশোকার ব্যাপার নিয়ে আমাকে আবার ব্ল্যাকমেল না করে।...

ধনঞ্জয় ফিরে আসে। তাব হাতে কালো রঙের শিশি। স্মেলিং সল্টে কাজ হয়। মীরার কাঁধের উপর ভর করে উঠে বসেন মহামায়া দেবী।

মিঃ গুপ্ত চিন্তার উত্তেজনায় ক্ষিপ্তের ন্যায় হাতের মুঠোয় ঘুষি মেরে হঠাৎ বলে ওঠেন—

'ইফ হি ডাস দ্যাট, আ'ল হ্যাভ হিম ইমিডিয়েটলি এরেস্টেড্।' আক্রোশে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। চাপা গলায় বলেন—"ইমপস্টর! স্মাগলার!" বলতে বলতে জানালার দিকে পাইপ মুখে এগিয়ে যান।

নির্মল মিঃ গুপ্তের আকস্মিক উত্তাপে ও কথাবার্তায় বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে বলে—"কি বলছেন আপনি? কাকে এরেষ্ট করবেন? ইমপস্টর, স্মাগলারই বা কে? ব্যাপার তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

মিঃ গুপ্ত কতকটা সামলে নিয়েছেন নিজেকে, পিছন ফিরে বলেন—"যাকে বলেছি সে ঠিক বুঝতে পেরেছে। তুমি বাবাজী অনর্থক উতলা হ'য়ো না। বেয়ানকে নিয়ে বাড়ীর ভিতর যাও। শুইয়ে দাওগে বিছানায়। আজকে একাদশী—নির্জলা একাদশী কি সহ্য হয় এই বয়সে? দুর্বলতার জন্যই ওরকম হয়েছে। আর উত্তেজনার কারণও তো কম নয়। মেয়েটার কপাল—কোথায় সেবা করবে শাশুড়ীকে এই সময়, না পড়ে রইল মাথা ফাটিয়ে বিছানায়।"

মুহূর্তের জন্য থামেন, পায়চারি করতে করতে পুনরায় বলেন—"তোমরা ওকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাও, আমি এখানে অপেক্ষা ক'রছি।"...

মহামায়াদেবী নির্মল ও মীরার কাঁধের উপর ভর দিয়ে বেরিয়ে যান ঘর ছেড়ে।

মিঃ গুপ্ত অলোকের দিকে পিছন ফিরে পরম অবজ্ঞা ভরে পাইপ টেনে চলেন।

অপমানে, বিস্ময়ে, ক্ষোভে—অলোকের কান দিয়ে আগুন বের হতে থাকে। সেও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

—ছাব্বিশ—

মিঃ গুপ্তের উষ্মা ও অস্বাভাবিক আচরণে নির্মল ক্ষুব্ধ হয়, কিন্তু যখন মিঃ গুপ্ত তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে কথা বলতে চান তখন নির্মল ভেবে নেয় মিঃ গুপ্তের আচরণের পিছনে এমন কোন গোপন রহস্য আছে যা তার জানা নেই।

"ওর আসল নাম কি জানো—ধনঞ্জয় বোস নয়—অলোক রায়। এই নামও যে ওর প্রকৃত নাম তাও ঠিক ঠিক বলা চলে না।

কাল ভোর হ'তে না হতেই পুলিশ ডেকে ওকে হ্যাণ্ড ওভার করে দাও। যদি না কর তুমিও জড়িয়ে পড়বে বলে দিচ্ছি।"

যুদ্ধের অবস্থা অনির্দিষ্ট, ইম্ফলের কাছাকাছি এগিয়ে আসছে জাপানী ফৌজ, তার সঙ্গে সুভাষ বোসেরও যোগ আছে কানাঘুষা শোনা যায়। বাঙ্গালায় বহু স্পাই কাজ ক'রছে।...

দম নিয়ে পুনরায় সুরু করেন মিঃ গুপ্ত—

"যে লোক বেমালুম নাম ভাঁড়িয়ে রেডিয়োয় বেহালা বাজায় সে স্পাই ছাড়া আর কিছুই নয় এ আমি তোমায় বলে দিচ্ছি। এর মধ্যেই কত কি করে বসে আছে কে জানে? ঘরের মধ্যে এসব বিপজ্জনক লোককে স্থান দেওয়া মোটেই উচিত হয় নি। বিশেষ করে তোমার দাদু রায় বাহাদুর স্বর্গীয় বিশ্বেশ্বর রায়কে ইংরেজ সরকার বরাবর খাতির করে এসেছেন। পঞ্চম জর্জের দরবারে পর্যন্ত তাঁর নিমন্ত্রণ হয়েছিল। সেই লোকের একমাত্র উত্তরাধিকারী হয়ে তুমি বাবাজী কি করে একজন স্পাইকে আশ্রয় দিয়েছ ভেবেও পাই না। সাবধান বাবাজী, আর আগুন নিয়ে খেলা করো না।"

"এ সবই আপনার সন্দেহ। সত্যি সত্যি অকাট্য প্রমাণ না পেয়ে একজন ভদ্রলোকের ছেলেকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া যায় কি? তাছাড়া ইংরেজের বিরুদ্ধে স্পাইগিরি—"

"কি বল্লে!"

"না, বলছি, দেশের বিরুদ্ধে স্পাইগিরি ক'রছে এমন কী প্রমাণ পেয়েছেন? নাম ভাঁড়িয়েছে! আচ্ছা, আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন। আমি একবার নীচে গিয়ে ধনঞ্জয়ের সঙ্গে কথা বলে কৌশলে জেনে নি সত্যি ব্যাপারটা। যদি সত্যি সত্যিই নাম ভাঁড়িয়ে থাকে, ভড়কে যাবে নিশ্চয়, এক মুহূর্তেই উত্তর দিতে পারবে না।"

নির্মল নীচে নেমে আসে।...

ধনঞ্জয় চুপচাপ ড্রয়িংরুমে বসে একটা মাসিক-পত্রিকার পাতা উল্‌টে যাচ্ছিল। নির্মলকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়ায়, বলে—

"আমাকে বিদায় দিন। আমি আপনার মুখ চেয়েই এতক্ষণ অপমান সহ্য করে বসে আছি। আপনি হয়তো মিঃ গুপ্তের কথা বিশ্বাস করেন নি, কিন্তু তিনি যখন আপনার গুরুজন হতে চলেছেন, তখন আপনারও উচিত হবে না এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করা।"

নির্মল ধনঞ্জয়কে কাঁধে হাত দিয়ে বসিয়ে দেয়, নিজে পাশে বসে। পকেট হাতড়ায়, সিগারেটের কৌটোটা ফেলে এসেছে, চুরুটও নেই, পাইপও নেই। অগত্যা একটা কাঠের রুল টেনে নিয়ে খেলাচ্ছলে বলে—

"আমি খুবই লজ্জিত, ধনঞ্জয়। ব্যাপারটা যে এমন অশোভন ভাবে টার্ণ নেবে তা ভাবি নি।"

"আমিও আশ্চর্য হয়ে গেছি কি করে ভদ্রলোক এতটা রূঢ় ব্যবহার ক'রলেন।"

"আজকে রাত্রের মতন এখানেই থাক। তোমার বিছানা এই ঘরেই করতে বলে দিয়েছি। কাল সকালে উঠেই তুমি চলে যেও।"

ধনঞ্জয়ের মনের ক্ষোভ খানিকটা ক্ষয় হয়ে যায় কথায় কথায়। অবশেষে নির্মল প্রশ্ন করে, "আচ্ছা একটা কথা তোমাকে জিগ্যেস ক'রব, কিছু মনে ক'রো না কিন্তু। তোমার প্রকৃত নাম কি ?"

নির্মলের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, অলোক হেসে বলে—"আপনারও দেখছি মনে একটু সন্দেহের ছায়া এসেছে। ভাবছেন বার্মা থেকে এসেছে, স্পাই টাই হবে হয়তো। তা আপনাদেরই বা দোষ দেব কি ! আমার অদৃষ্টই এমন, যেখানেই যাই, সবাই স্পাই মনে করে। ভুল ক'রে হলেও করে। এক বছর আগে বেসিনে—"

"কি বললে, বেসিনে !"

"হ্যাঁ, বেসিনে একটা ভাঙ্গা গুদোমঘরে অনেক কষ্টে আশ্রয় নিয়েছিলাম, ১০৫এর উপর ম্যালেরিয়া জ্বর, প্রায় মরমর অবস্থা—মাতাল গোরা দু'টো কোথা থেকে এসে জুটল, স্পাই ভেবে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেল রাস্তায়। যা অত্যাচার ক'রল তাতে যে আমি কি করে বেঁচে আছি এখনো সেই কথাই মাঝে মাঝে ভাবি।"

নির্মল স্তব্ধভাবে গভীর দৃষ্টিতে ধনঞ্জয়ের মুখের ভাব লক্ষ্য করে, হঠাৎ কি যেন স্মরণ করে বলে—"দাঁড়াও, আমি এখুনি আসছি।" সিঁড়ির উপর সেই অয়েল-পেণ্টিং ! মুখের সঙ্গে কি অদ্ভুত মিল ! এও কি সম্ভব !

"আচ্ছা ধনঞ্জয়, তোমার প্রকৃত নাম অলোক রায়, নয় কি ?"

"কি করে জানলেন ?

"জেনেছি একটি মেয়ের কাছে। আচ্ছা, সে সব কথা পরে হবে। এখন শুধু উত্তর দিয়ে যাও আমার প্রশ্নের।"

"তুমি অশোকার ফটোটা দেখে চমকে উঠেছিলে কেন ?"

অলোক হঠাৎ উত্তর দিতে পারে না। ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলে—"কি বল্লেন ? অশোকা ! —না তো।"

"অস্বীকার কোরো না।"

"হ্যাঁ, চমকেছিলাম।"

"কেন ?"

"ওঁকে আমি চিনতাম।"

"কি করে চিনলে ?"

"বার্মার পথে আসতে আসতে ওঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সাহায্যও কিছু করেছিলাম। অশোকা দেবী হয়তো এখনো স্বীকার করবেন। তাঁর বাবার কথা বলতে পারি না।"

"তাহলে স্বীকার ক'রছ তুমি অশোকাকেই ভালবাসো ?"

"এ আপনি কি বলছেন ! না, না, না, ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ। এসব কথা আপনি ভুলেও মনে ঠাঁই দেবেন না। আজ বাদে আপনার স্ত্রী যিনি, তাঁকে নিয়ে রহস্য করা উচিত নয় আপনার পক্ষে। আর আপনিই এখন আমার অন্নদাতা।"

"কিন্তু, আমি কি ক'রব বল ? অশোকা নিজমুখে আমার কাছে স্বীকার করেছে, সে আমাকে ভালবাসে না, ভালবাসতে পারবেও না কোনদিন। এ অবস্থায় আমি কি করতে পারি ?"

"না, না, এরকম কথা কোন মেয়েই বলতে পারে না। আপনি রহস্য ক'রছেন। আপনার মতন বর পাওয়া কি সাধারণ ভাগ্যের কথা !"

"বটে, তুমি তো বড় মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিত দেখছি ! আচ্ছা এখন চলো, খাওয়া দাওয়া সারা যাক—দাঁড়াও একটা কথার এখনো উত্তর দাও নি।—নাম ভাঁড়িয়ে ছিলে কেন বল তো ?"

"নাম ভাঁড়াইনি, ধনঞ্জয় বোসই আমার প্রকৃত নাম। বাবা ঐ নাম দেন। গবর্ণমেণ্টের খাতায়, ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় এই নামই ব্যবহার ক'রে এসেছি। অলোক রায় নামটা পিসিমার দেওয়া।

শেষের নামটা আমার নিজের খুব পছন্দ। সাধারণের কাছে আমি ঐ নামেই নিজের পরিচয় দিতাম।"

"তোমার পিসীমা কোথায় থাকেন? কি নাম তাঁর?"

"তাঁর নাম ভুলে গেছি। পিসীমা এখনো বেঁচে আছেন কিনা বলতে পারব না। কোথায় যেন পশ্চিমে বিয়ে হয়েছিল তাঁর।"

নির্মল গম্ভীরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করে।

"বোস রায় হ'ল কি করে?"

"রায় নবাবী আমলের উপাধি হয়তো। পূর্বপুরুষদের অবস্থা নাকি ভাল ছিল। মার কাছে শুনেছি বছর ত্রিশেক আগেও আমার ঠাকুর্দার জমিদারী ছিল।"

"জমিদারী কি করে গেল?"

"ঠিক বলতে পারব না, ওসব কথা উঠলে বাবা কেন জানি না বড্ড গম্ভীর হয়ে যেতেন, মায়েরও চোখের কোণায় জল আসত। আমি আর জিগ্যেস করতে সাহসী হতাম না। যতদূর স্মরণ আছে, মা একদিন আমাকে বলেছিলেন—ঠাকুর্দা খুব রাগী ছিলেন—বাবার উপর রাগ করে কাশী চলে যান, আর এদিকে বাবাও গান বাজনা নিয়ে মাতেন, জমিদারী নিলামে ওঠে। নায়েব গোমস্তার হাতে পড়লে যা হয়।"

"কোথায় তোমার ঠাকুরদার জমিদারী ছিল?"

"সে সব কিছুই বলতে পারব না আপনাকে। এ সব কথা যখন হতো তখন আমি খুব ছোট। তাছাড়া বাবার মনে দুঃখের স্মৃতি না জাগানোই শ্রেয়ঃ ভেবে মাও এসব প্রশ্নে আমাকে কোনদিনই উৎসাহ দেন নি। এখন এসব আলোচনা করে লাভও নেই। যা গিয়েছে তাতো গিয়েছেই।"

"তোমার ঠাকুরদার নাম কি?"

"ঐ যে বল্লাম, কিছুই মনে নেই ঠিক, বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর গোছের

কি যেন একটা নাম একদিন মা অসতর্কভাবে আমার কাছে বলে ফেলে জিব কাটেন।"

"কেন ?"

"বাবার বোধ হয় ইচ্ছে ছিল না আমি ঠাকুরদার পরিচয় জানতে পারি। আমার সন্দেহ হয় কি একটা ব্যাপারে বাবার মনে দারুণ অভিমান ছিল ঠাকুরদার উপর। মার কাছে জানতে চেয়েও ঠিক ঠিক উত্তর পাই নি। আমার বয়েস যখন দশ বছর, বাবা মা দুজনেই আট-চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে মারা যান—ম্যালিগ্ন্যাণ্ট ম্যালোরিয়ায়। এখন আর ঠাকুরদার পরিচয় খুঁজে বের করার কোন সূত্রই নেই।"

নির্মল গাঢ়স্বরে প্রশ্ন করে—"তোমার বাবার নাম কি ?"

"কেন বলুনতো, আজকে হঠাৎ নাম জানতে চাচ্ছেন ? এর আগে তো একদিনও জিগ্যেস করেন নি ! ভয় নেই—আমি জাপানী স্পাই নই—বিশ্বাস করুন।"

"বেশতো, বলেই ফেল না নামটা—এত কুণ্ঠা কেন ?"

"না কুণ্ঠা নয়, তবে আশ্চর্য লাগছে এই জন্য, মিঃ গুপ্ত আমাকে দেখে ক্ষেপে গেলেন—আর আপনি আজ এতদিন চাকরী করবার পর পিতৃ-পুরুষের খোঁজ নিচ্ছেন—সত্যি কথাটা খুলেই বলুন না—কি আপনাদের মনের সংশয়। আমার এমন কোন গোপন অতীত নেই যার জন্য আমি লজ্জিত হতে পারি।"

নির্মল ডাক্তার স্থিরদৃষ্টিতে অলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কয়েকমুহূর্তের জন্য ; অলোক অস্বস্তি অনুভব করে, নির্মলের দৃষ্টির সঙ্গে তার দৃষ্টির বিনিময় হয়। নির্বাক প্রশ্ন দু'জনের মনে।

নির্মল মৌনতা ভঙ্গ করে বলে—"তোমার পিতৃপুরুষের পরিচয় নেবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বলেই প্রশ্ন করছি—তুমি উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে যাচ্ছ কেন ? আচ্ছা, আমি যদি বলি তোমার পিতার নাম ৺অংশুপ্রকাশ রায় ?"

"কি আশ্চর্য ! আপনি জানলেন কি করে ?"

"আর মায়ের নাম উজ্জ্বলা রায় ।—কেমন তাই না ?"

অলোক বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে নির্মলের দিকে চেয়ে থাকে ।...

নির্মল জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখে। পাইন গাছগুলো রাত্রির ম্লান আলোকে দাঁড়িয়ে আছে নিস্তব্ধ সাক্ষীর ন্যায় । পাতাগুলো কি নড়ছে ? ওরা কি তার দ্বন্দ্ব অনুভব করেই চঞ্চল হয়ে উঠল ?

—সাতাশ—

প্রকাণ্ড বাড়ীটা এখনো ঘুমে অচেতন। দেওয়ালের ইলেকট্রিক ঘড়িটায় বাজনা বাজে, ভোর পাঁচটা। পা টিপে টিপে মিঃ গুপ্ত নীচে নেমে আসেন।

নীচের ড্রয়িংরুমের কাছে এসে দেখেন, অলোক বিছানায় নেই। মিঃ গুপ্তের মতলব ছিল অলোককে কিছু টাকার লোভ দেখিয়ে নির্মলের বাড়ী থেকে চিরকালের মতন দূর করার ব্যবস্থা করা। সকাল পর্যন্তও দেরী করা চলে না, যদি কোন বেঁফাস কথা নির্মলের কানে দেয়, তাহলে সম্বন্ধটাই ভেস্তে যাবে। নির্মলের ভাবভঙ্গী কেমন যেন, পুলিশের হাতে যে অলোককে দেবে না সে বিষয়ে মিঃ গুপ্ত নিঃসংশয় হয়েছেন। ছেলেটা অতিশয় ধূর্ত, এর মধ্যেই কি যেন মন্ত্র দিয়েছে কানে, নৈলে একসঙ্গে খেতে বসে এত হাসাহাসি করে? এতো যে সাবধান করে দিলেন, কৈ কিছু ফল হ'ল কি?

অশোকার উপরেও তাঁর বিরক্তি এসে গিয়েছে কম নয়। কেমন ধারা মেয়ে তুই! একটা আই সি এস, এম বি ই—যার সমাজে কতবড় সম্মান, তাঁর মানটা তোর কাছে কিছুই নয়! সব ভুলে, ছুটে গেলি তুই রেডিয়োস্টেশনে! কোথাকার কে বেহালা বাজাচ্ছে তার খোঁজে! বেহালা! বেহালা!! বেহালা!!! বেহালার সুর পেয়ে বসেছে মেয়েটাকে। হতভাগা মেয়ে!

না হয় সাহায্য করেছিল। কি হয়েছে তাতে? ডোবা মানুষকে টেনে তোলে নৌকোর মাঝি, তাই বলে কি মাঝি মাঝি করে কেউ পাগলের মতন ছুটে বেড়ায়?

মিঃ গুপ্ত কিছুতেই ভেবে পান না কি করে তাঁরই মেয়ে হয়ে অলোকের মতন একটা সাধারণ অবস্থার লোককে অশোকা মনে

মনে শ্রদ্ধা ও প্রীতির চোখে দেখে। কৃতজ্ঞতার নামে তো বাড়াবাড়ি চলে না। তোমার আজ বাদে কাল বিয়ে, তুমি বাড়ী ছেড়ে ছুটলে—কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে! মরে নি—বেঁচে আছে—বেশতো—খোঁজ নিতে পরের দিন। রেডিয়োস্টেশনে চিঠি লিখেই তো সব খবর পাওয়া যেত। না হয়, একদিন অলোককে ডেকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে দেওয়া যেত।

পরক্ষণেই চিন্তাধারায় ধাক্কা খান। না, না, ভীষণ ডেনজারাস লোক। এদের সংশ্রব যতটা এড়িয়ে যাওয়া যায় ততই ভাল। আর কোন সন্দেহ নেই। স্পাই মাত্রেই বাজনা বাজায়। ঐ ক'রেই তো সাধারণের সঙ্গে যোগ রাখে ওরা! আশোকাকে মেসমেরাইজ করেছে কিনা কে জানে! ফাইল চুরি করে নি তো? ট্রানসপোর্ট ডিপার্ট-মেণ্টের কাজ তাঁর হাতে—সুন্দরবনে কত নৌকো আছে? কতটা হাতী পাওয়া যেতে পারে—আসামে? স্টীমার, ব্রিজ...না, না, আর কোন সন্দেহই নেই। নির্মল দেখা যাচ্ছে, এখনো একেবারেই ছেলেমানুষ, সহসা কাউকে অবিশ্বাস করতে চায় না, বলে—ভদ্রলোকের ছেলে—অকাট্য প্রমাণ না পেলে পুলিশে দেওয়া যায় না। কিন্তু কি যে বিপদ ডেকে এনেছে সে—

কে কথা বলছে ঐ বাগানে বসে! মিঃ গুপ্তের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে।

নানা সন্দেহ মিঃ গুপ্তের মনকে দোলা দেয়। করিডর বেয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে যান, দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে শুনবার চেষ্টা করেন। কান পেতে।...

জানালার নীচেই পাথরের বেদীর উপর দু'জন বসে আছে। কারা ওরা?...

এ কার গলা! এ যে মহামায়া দেবীর কণ্ঠস্বর! সে কি! নির্মলের মা! তিনি এত ভোরে কার সঙ্গে কথা বলছেন! অপর লোকটাই বা কে! চুপ করে বসে আছে মুখ ঘুরিয়ে!

ভাঙ্গা কাঁচের জানালার ফাঁক দিয়ে একদৃষ্টিতে চেয়ে দেখেন মিঃ গুপ্ত। অস্পষ্টমূর্তি হলেও চিনতে কষ্ট হয় না। একটি মূর্তি মহামায়া দেবীর, আর একটি অলোকের।

এখানেও অলোক!

বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে মিঃ গুপ্ত চোখ রগড়ান।

মহামায়া দেবীর কি দরকার থাকতে পারে অলোকের সঙ্গে? এ গোপনীয়তার কি কারণ? বিদ্যুতগতিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উদিত হয় তাঁর মনে।

একি শুনছেন!...অলোক—মানে—বার্মার সেই সহযাত্রী রেলের মাস্টার! ভুল দেখছেন না তো? না, না, ভুল কি করে হবে। ঐ তো মুখ ফিরিয়েছে, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে—অলোক!

পিসীমা! কি অদ্ভুত কথা।...অলোকের কথাগুলো পরিষ্কার শোনা যায়—"শুধু এই আশীর্বাদ কর পিসীমা—তোমাদের সম্পত্তির উপর কোন লোভই যেন আমায় স্পর্শ না করে। ঠাকুরদা যদি ছেলে বৌকে তাড়িয়ে দিয়ে কোন খোঁজ না নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে পারলেন, তখন আমিই বা কেন তাঁর অর্জিত অর্থ ও সম্পত্তি স্পর্শ করতে যাবো?"

"পাগল ছেলে!—ঠিক দাদার মতন দেখছি তোরও অভিমান!"...

মহামায়া দেবী সস্নেহে অলোকের পিঠে হাত রাখেন।

"তুমিও তো খোঁজ নিতে পারতে পিসীমা, আজকে হঠাৎ—"

"কি করব বল্—আমি একে মেয়েমানুষ—পরের অধীন—তোর পিসেমশায়ও এমন সময় মারা গেলেন—আর আমি একা। তাও খোঁজ নিয়েছিলাম—ম্যানেজার কাকার ভাইপো হরকান্তকে পাঠিয়ে কাশী, এলাহাবাদ, মাদ্রাজ, বোম্বে, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, পাটনা—যত জায়গায় সন্দেহ হয়েছে খোঁজ করিয়েছি। জানতে পারলে পাছে বাবা বাধা দেন তাই এষ্টেটের তবিল থেকে এক পয়সাও নিই নি। নির্মলের বাবার নামে

যে টাকা ইনসিওর ছিল সেই টাকা ভাঙ্গিয়েই সমস্ত খরচা চালিয়েছি। কি করে তখন জানব তোরা রেঙ্গুনে চলে গিয়েছিস!”

“আচ্ছা, তুমি নাকি আমার নাম দিয়েছিলে অলোক?”

“বৌদির কাছে শুনেছিস নিশ্চয়। বৌদি বড় ভালবাসতেন আমায়। তোরা তখন শ্যামবাজারে যদুবোস লেনের একটা পুরনো সেঁতসেঁতে বাড়ীতে থাকতিস। তোর জন্মও ঐ বাড়ীতে। ব্রাহ্ম ঘরের মেয়ে হলে কি হবে, আসলে হিন্দু ঘরের মেয়ের সঙ্গে বৌদির তফাৎ কিছুই দেখিনি। বাবার মন কিছুতেই টলাতে পারলাম না সেই সময়—পরে অবশ্য তিনি মত বদলেছিলেন। আজকাল কত ব্রাহ্ম মেয়েরই তো বিয়ে হচ্ছে হিন্দু ঘরে!—ভবিতব্য! বৌদি আর দাদাকে হারাতে হোল চিরকালের জন্য!...”

মহামায়া দেরী সিল্কের চাদরটা গায়ের উপর জড়াতে জড়াতে মুখ ফেরান। চশমাটা খুলে চোখ মোছেন। তাঁর ঠোঁটের কোণায় বিষণ্ণ হাসির রেখা। অতীতের দুঃখ ও বর্তমানের অনিশ্চয়তার ছাপ নিয়ে সে রেখা ভোরের অস্পষ্ট আলোকে মিলিয়ে যায়। অলোকের বুক ভেদ করে দীর্ঘনিঃশ্বাস বের হতে চায়। মিঃ গুপ্ত টলতে টলতে করিডরের ভাঙ্গা বেঞ্চটার উপর বসে পড়েন।

...দোতালার ঘরে চেয়ারে হেলান দিয়ে ফিরিঙ্গি নার্সটা কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। বিছানা ছেড়ে সন্তর্পণে উঠে দাঁড়ায় অশোকা। ব্যথায় টনটন করে কপাল। দুর্বল শরীর থরথর করে কাঁপতে থাকে। তবুও এগিয়ে যায় সে।

খোলা জানালা দিয়ে চোখে পড়ে সামনের রাস্তাটা কোথায় যেন বেঁকে মিশে গিয়েছে—দেখা যায় না আর।